সম্পাদকীয়

ঈদুল আযহিয়া মুবারক হোক

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে হজ্জ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পবিত্র জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লাখো লাখো মানুষ বায়তুল্লাহ শরীফে সমবেত হয়।

সূরা আলে ইমরানের ৯৮ নং আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা নির্দেশ করেছেন যে, **ওয়া লিল্লাহি আলান্নাসি হিজ্জুল বায়তি** অর্থাৎ–হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধর কিংবা কেবল আরববাসীদের ওপরই এটা ফরয নয় যে তারা বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করুক বরং বায়তুল্লাহ নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য এটা যে জগতের সব জাতি বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করার জন্য এই পবিত্র ভূমিতে সমবেত হোক। যাহোক, আল্লাহ্‌ তাআলাই হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে জানিয়েছেন এটা এমন একটি ঘর যে বিশ্বের সব জাতি যারা আমার ওপর ঈমান আনবে আমার রাসূল (সা.)-এর ওপরও ঈমান রাখবে এবং খাতামান্নাবীঈন (সা.)এর হাতে হাত রেখে আমার আনুগত্যের জোয়াল নিজেদের কাঁধে তোলে নেবে, তাদের জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ ফরযরূপে (বাধ্যতামূলক) নির্ধারণ করে দেয়া হবে। আর এভাবে সেই স্থানকে সৃষ্টির প্রত্যাবর্তনস্থল এবং জগতের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করে দেয়া হবে। আর আজ জগতবাসী সূরা আলে ইমরানের এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে।

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বলেন যে, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ কেবল প্রকাশিত দৃশ্যমান মানাসেক হজ্জের অর্থাৎ বাহ্যিক নিয়ম কানুনের নামই নয়, বরং ইসলামে প্রতিটি ইবাদতের আড়ালে ওটার এক রূহ্‌ (আত্মা) আছে অর্থাৎ অন্তর্নিহিত এক তাৎপর্য আছে - দৃশ্যমান ইবাদত, ইবাদত রূপ দেহের বা বহিরাবরনের কোমনীয়তা-সজীবতা ইত্যাদি রক্ষা করে। এর আড়ালে রয়েছে এক আত্মা, যে ব্যক্তি আত্মার যত্ন নেয় না আর শুধু দেহেরই যত্ন-আত্তিতে ব্যতিব্যস্ত সে এক মৃতদেহের পরিচর্যাকারী, তার ওই ইবাদতের, যার আত্মার (অন্তর্নিহিত তাৎপর্য) খেয়াল রাখা হয়নি, এর কোনই পুণ্য লাভ হবে না, বরং তার সাথে তার প্রভু প্রতিপালকের সেই ব্যবহারই হবে যা ‘মৃতের পূজারী’ এক ব্যক্তির সাথে হওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) হজ্জ সম্পর্কে বলেন, ‘প্রকৃত কথা এটা যে, সালেক (আধ্যাত্মিক জগতের অভিযাত্রী)-এর শেষ অবস্থান যা মর্যাদার এমনই স্তর যে, কামনা-বাসনা ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র ভালবাসায় আর পরম উপাস্যের প্রেমে সে বিভোর হয়ে যাবে। প্রেম ও ভালোবাসা যদি তা সত্যিই হয়, তবে সে স্বীয় জীবন ও নিজ অন্তর পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ করে দেয়, আর বায়তুল্লাহর চারদিকে প্রদক্ষিণ তো ওই উৎসর্গীকরণেরই দৃশ্যমান এক নিদর্শন। এক বায়তুল্লাহ্‌ যেমন ইহজগতের ভূপৃষ্ঠেই রয়েছে তেমনই উর্ধ্বালোকেও এটি বিদ্যমান। যতক্ষণ সেটার প্রদক্ষিণ করা না হয় এরও প্রদক্ষিণ হয় না।

৩০ নভেম্বর ২০০৯

সূচীপত্র *পৃষ্ঠা নং*

- **কুরআন শরীফ** ২
- **হাদীস শরীফ** ৩
- **অমৃত বাণী** ৪
- *জুমুআর খুতবা ঃ* ৫-১১
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল্‌ খামেস (আই.)
- **নেযামে নও (নব বিশ্ব-ব্যবস্থা)** ১২-১৫
  ভাষান্তর ঃ মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্‌
- **মমতাময় যে পরশ বেদনার অশ্রু মুছে দেয়** ১৬-২০
  মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
- **যুগ-খলীফার দিক দিশারী বাণী :** ২১
  হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
- **ইসলাম প্রচার প্রসার ও বিস্তারে আহমদীয়াত** **২২-২৫**
- **সত্যের সন্ধানে** ২৬
  কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী
- **পবিত্র হৃদয়ই কেবল পবিত্রময় সত্তাকে পেতে পারে** ২৭
  মাহমুদ আহমদ সুমন
- **খিলাফত হারা মুসলমানদের অমানবিক কর্মকান্ড** ২৮-৩০
  ডা. শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ
- **হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এর বাংলাদেশ সফর**
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল ৩১-৩২
- **সংবাদ** ৩৩-৩৪
- **কৃষিপাতা** ৩৫-৩৬

প্রচ্ছদ ডিজাইন : তারেক আহমদ সবুজ

এর (ইহজগতের বায়তুল্লাহ্‌র) প্রদক্ষিণকারীরা সকল পরিধেয় পোশাক খুলে ফেলে, দেহে একটিই মাত্র কাপড় জড়িয়ে রাখে, কিন্তু সেটার (উর্ধ্বালোকের) প্রদক্ষিণকারী সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে খোদার কারণে খোদারই জন্য বিবস্ত্র হয়ে যায়। প্রদক্ষিণ করা–পরম উপাস্যের প্রতি প্রেম ভালোবাসার ঐশীপ্রেম-প্রকাশক এক বাহ্যিক নিদর্শন। প্রেমিক তাঁর (প্রেমাস্পদের) চারপাশে ঘুর ঘুর করে। এমন যে, তার নিজস্ব ইচ্ছা ও সন্তোষের কিছুই আর বাকী থাকে না। তাঁরই পাদপীঠে সে উৎসর্গকৃত হয়ে থাকে।’ (সিরাতুল হাকায়েক, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ২৬) এরই প্রতীকি প্রকাশ ঘটানো হয় ঈদুল আযহিয়ার দিনে পশু কুরবানী করার মাধ্যমে। এটাই হলো আধ্যাত্মিক হজ্জ–আধ্যাত্মিক ভাবে যতক্ষণ কেউ সেই বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ না করে, জাগতিক হজ্জ পালনও গ্রহণীয় হতে পারে না। তেমনি গ্রহণীয় হতে পারে না সেই কুরবানীও।

আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের সকলকে হজ্জ ও কুরবানীর মর্মার্থ অনুধাবনের তৌফিক দান করুন।

কুরআন শরীফ
সূরা হুদ-১১

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرٰهِيمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ٧٠

৭০। আর নিশ্চয় আমাদের প্রেরিতরা[১৩৩০] সুসংবাদসহ ইব্‌রাহীমের[১৩৩১] কাছে এলো। তারা 'সালাম' জানালো। সে-ও বললো, 'সালাম'। আর সে অনতিবিলম্বে একটি ভুনা বাছুর নিয়ে এলো।

فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلٰى قَوْمِ لُوطٍ ٧١

৭১। কিন্তু সে যখন দেখলো তারা এর দিকে হাত বাড়াচ্ছে না তখন সে তাদেরকে আগন্তুক বলে মনে করলো এবং তাদের দিক থেকে ভীতি অনুভব করলো। তারা বললো, 'ভয় করো না। কেননা আমরা লূতের জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি[১৩৩২]।'

১৩৩০। কারা 'প্রেরিতগণ' ছিলেন–এই বিষয়ে তফসীরকারকদের মধ্যে অনেক মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, তারা মানব ছিলেন, আবার কারো কারো মতে তারা ফিরিশ্‌তা ছিলেন। পূর্ববর্তী মত ও প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতার অধিকতর নিকটবর্তী বলে মনে হয়। ইব্‌রাহীম এবং লূত (আ.) উভয়ে সেই স্থানে বহিরাগত হওয়ার কারণে, তা খুবই স্বাভাবিক যে আল্লাহ্ তাআলা উক্ত অঞ্চলের কিছু ধর্মপরায়ণ লোককে তার জাতির ওপর আযাব পতিত হওয়ার পূর্বেই লূত (আ.)-কে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে, এই 'প্রেরিতগণ' শাস্তির প্রথম সতর্কবাণী রূপে আগমন করেন নি। লূত (আ.)-এর জাতিকে বহু পূর্বে 'আযাব' সম্বন্ধে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল (১৫ : ৬৫) সেই 'প্রেরিতগণ' শুধু তাঁকে পূর্বে হুশিয়ারকৃত শাস্তির নির্ধারিত সময় আগত হওয়ার সংবাদ দিতে এসেছিলেন।

১৩৩১। ইব্‌রাহীম (আ.) এর আসল নাম ছিল 'আব্রাম'। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জন্মের পরে, আল্লাহ্ তাআলার আদেশ অনুযায়ী তিনি আব্‌রাহাম নামে অভিহিত হলেন যার অর্থ হল: মানব সাধারণের পিতা এবং আব্‌রাহাম থেকে আরবীতে ইব্‌রাহীম করা হয়েছে। তাঁর বংশের এক শাখা ইসরাইলীরা কেনানে বসবাস করত এবং অপর শাখা ইসরাইলীরা আরবের বাসিন্দা ছিল।

১৩৩২। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) 'প্রেরিতগণকে' সাধারণ পথিক বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু যখন সামনে পরিবেশন করা তাজা গো-বৎসের মাংস খেতে তাঁরা বিরত থাকেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা বিশেষ কোন কার্যে প্রেরিত হয়েছেন, যা তিনি বুঝতে সক্ষম হননি 'তাঁদের ব্যাপারে ভীত হলেন' কথার অর্থ এই নয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) অচেনা-অজানা লোক দেখে ভয় পাচ্ছিলেন, বরং তারা খাদ্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করায় তিনি এই ভয়ে খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন যে, হয়ত–

(অবশিষ্টাংশ ১৫-এর পাতায় দেখুন)

হাদীস শরীফ

মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য

১। হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। সে অন্যের প্রতি যুলুম করে না এবং তাকে অন্যের হস্তে (যুলুমের উদ্দেশ্যে) সমর্পণ করে না; যে তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। যে কেউ মুসলমানের কষ্ট দূর করে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন। যে কেউ মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে আল্লাহ্ কেয়ামতের দিনে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হযেছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন : এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করে না। তাকে লাঞ্ছিত করে না এবং তাকে ঘৃণা করে না। (বুকের ভিতরের দিকে তিনবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বললেন) তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি) এখানে। এক মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করা এক গুরুতর অন্যায়। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি এবং সম্মান অন্য একজন মুসলমানের নিকট পবিত্র। (মুসলিম)

৩। হযরত মুস্তাওবেদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি অপর এক মুসলমানের গ্রাস আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ নিশ্চয় ওটার অনুরূপ তাকে দোযখ হতে আহার করাবেন। যে কেউ এক মুসলমানের কাপড় (ছিনিয়ে নিয়ে নিজে পরে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে ওটার অনুরূপ দোযখ হতে পরাবেন; এবং যে কেউ অন্যের সম্মানহানি করে, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তার সম্মানহানি করবেন। (আবুদাউদ)

৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্নিত আছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ নিশ্চয় তোমরা একে অন্যের জন্য দর্পণ-স্বরূপ। সে যদি তাতে কোন ধূলি দেখে, নিশ্চয় সে তা ঝেড়ে দেয়। (তিরমিযী)। এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীর জন্য দর্পণ স্বরূপ এবং এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীর ভাই; সে তার ক্ষতি প্রতিহত করে এবং তার পশ্চাতেও তাকে রক্ষা করে। (আবু দাউদ তিরমিযী)

৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ একজন মুসলমান, যে সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল', তিনটি কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। এক-বিবাহের পর ব্যভিচার করলে তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করতে হবে, দুই-আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে নিশ্চয় তাকে হত্যা করবে, অথবা ফাঁসি দিয়ে মারবে অথবা দেশ হতে বহিষ্কার করে দিতে হবে, তিন-সে কোন মানুষকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে তাকে হত্যা করতে হবে। (আবুদাউদ)

৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অবশ্যই সহজ।

৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন : দুই বান্দা, একজন পূর্বের এবং অপর একজন পশ্চিমের, মহিমান্বিত আল্লাহ্র জন্য যদি পরস্পরকে ভালবাসে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে একত্রিত করে বলবেন, এ সেই ব্যক্তি যাকে তুমি আমার জন্য ভালবেসেছিলে। (বায়হাকী)

অনুবাদ –**মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ,**
সাবেক ন্যাশনাল আমীর

অমৃতবাণী
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

‘আমি দৃঢ় ইয়াকীন ও দাবীর সঙ্গে বলছি যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওপরে কামালতে নবুওয়াত (নবুওয়াতের পরিপূর্ণতা) শেষ হয়ে গেছে। সেই ব্যক্তি ঝুটা এবং প্রতারক যে তাঁর (সা.) খেলাপে বা বিরুদ্ধে এবং বাইরে কোন সিলসিলা কায়েম করে বা অন্য কোন ধারা স্থাপন করে। এবং তাঁর (সা.) নবুওয়াত থেকে আলাদা কোন সত্যতা উপস্থাপন করে এবং নবুওয়াতের ধারন-প্রবাহকে পরিত্যাগ করে। আমি পরিষ্কারভাবে বলছি, সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত, তাঁর (সা.) পরে, অন্য কাউকে স্বতন্ত্র নবী বলে বিশ্বাস করে, এবং তাঁর *খতমে নবুওয়াত*কে ভেঙ্গে ফেলে। এটাই হচ্ছে সেই কারণ যে জন্য, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর কোন নবী আর আসতে পারবে না যার ওপরে নবুওয়াতে মুহাম্মদীয়ার মোহর থাকবে না। আমাদের বিরুদ্ধবাদী মুসলমানেরা এই ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছে যে, তারা *খতমে নবুওয়াত* ভেঙ্গে ফেলে আসমান থেকে এক ইসরাইলী নবীকে আনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু, আমি বলছি যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্রকরণ শক্তি এবং তাঁর চিরন্তন নবুওয়াতের এ এক অসামান্য নিদর্শন যে, তেরশ’ বছর পরেও তাঁর (সা.) শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বা তালিম-তরবিয়তের ফলশ্রুতিতে তাঁর উম্মতের মধ্য থেকেই *মসীহ্ মাওউদ* অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্-এর আগমন ঘটেছে তাঁরই নবুওয়াতের মোহর ধারণ করে। এই আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস যদি কুফর হয়, তাহলে আমি সেই কুফরকে প্রিয় মনে করি। কিন্তু, ঐ সকল লোক যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, যাদেরকে নবুওয়াতের নূর থেকে কোন অংশই দেওয়া হয়নি, তারা বিষয়টিকে অনুধাবন করতেই পারে না এবং একেই কুফরী আখ্যা দান করে থাকে। অথচ, এটাই সেই সত্য, যার দ্বারা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণতা ও চিরজীবি হওয়া প্রমাণিত হয়। (আল হাকাম ১০ই জুন, ১৯০৫ পৃ: ২)

আমরা তো বলি যে, সেই ব্যক্তি কাফের যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শরীয়তের সামান্যতমও এদিক-সেদিক করে। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য থেকে যে ঘাড় বাঁকায়, সে-ই যখন আমাদের কাছে কাফের, তখন সেই ব্যক্তির আর কী অবস্থা, যে কোন নতুন শরীয়ত আনয়নের দাবী করে অথবা কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য ও রদবদল করে, অথবা কোন আদেশকে বাতিল বা *মনসুখ* মনে করে। আমাদের নিকটে তো ঐ ব্যক্তিই মু’মিন যে কুরআন শরীফের সঠিক আনুগত্য করে এবং কুরআন শরীফকেই *খাতামুল কুতুব* বা কেতাবসমূহের মোহর বলে বিশ্বাস করে, এবং সেই শরীয়তকে যা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে নিয়ে এসেছেন, তাকে চিরস্থায়ী বলে মান্য করে, এবং তার মধ্য থেকে এক অণু পরিমাণও পরিবর্তন না করে; এবং তার অনুবর্তিতায় *ফানা* হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে এবং আপন অস্তিত্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে এই পথে উৎসর্গ করে এবং কথায় ও কাজে, আচরণে ও বুদ্ধি-বৈভবে এই শরীয়তের বিরোধিতা না করে, তবেই তো সে সত্যিকার মুসলমান রূপে পরিগণিত হবে।’

(আল-হাকাম, ৬ মে ১৯০৮, পৃ: ৫)

সেই ব্যক্তি কাফের যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শরীয়তের সামান্যতমও এদিক-সেদিক করে।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ * اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ *

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ * صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ (آمين)

মু'মিনদেরকে যখন জুমুআর নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তাদের উচিত তারা যেন তাদের সব কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য তাড়াতাড়ি গুটিয়ে ফেলে মসজিদের দিকে রওয়ানা দেয়।

ইমামের খুতবা শোনার জন্য মসজিদের দিকে তাৎক্ষণিকভাবে যাওয়া উচিত।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৯-এর জুমুআর খুতবা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا ۨانْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

(সূরা জুমুআ : ১০-১২)

এ আয়াত সমূহের অনুবাদ হল- হে যারা ঈমান এনেছো! জুমুআর দিনের একাংশে তোমাদেরকে যখন নামাযের আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণের উদ্দেশ্যে দ্রুততার সাথে অগ্রসর হইয়ো এবং ব্যবসা-বানিজ্য পরিত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। এরপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র কল্যাণরাজির অন্বেষণ কর আর আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ কর যেন তোমরা সফলকাম হও। আর যখন তারা ব্যবসা বাণিজ্যের (মধ্য থেকে) হৃদয় আকৃষ্টকারী কোন কিছু দেখবে তখন তারা সেদিকে দৌড়ে চলে যাবে এবং তোমাকে একাকী দাঁড় করিয়ে রাখবে। তুমি বলে দাও, আল্লাহ্‌র কাছে যা কিছু রয়েছে তা হৃদয় আকৃষ্টকারী বিষয় ও ব্যবসা বাণিজ্য হতে উৎকৃষ্টতর। রিযেক দানকারীদের মধ্যে আল্লাহ্-ই সর্বোত্তম।

সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই আর তা হল, এই রমযান মাসের প্রায় প্রতিটি জুমুআর দিনে আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় বায়তুল ফুতুহ মসজিদে আগমনকারী নামাযীদের এত বেশি আধিক্য ছিল যে মসজিদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না তাই দরজা খুলে সামনের বারান্দায় নামাযীদের জন্য নামাযের জায়গা বানাতে হয়েছে বরং 'উপচে পড়া জনসমাগম'-এরও বাইরে চলে গেছে। এমন জনসমাগম সাধারণত বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে অথবা রমযানের শেষ জুমুআ সাধারণত যাকে জুমুআতুল বিদা বলা হয় তাতে হয়ে থাকে। সুতরাং প্রতিটি আহমদীকে সর্বদা এ কথা মনে রাখতে হবে যে, জুমুআর জন্য বিশেষ আয়োজন করে জুমুআর নামায পড়তে আসার নামই প্রকৃত জুমুআতুল বিদা। আল্লাহ্ তাআলার আদেশে আমরা আমাদের সব ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যস্ততা ভুলে জুমুআর নামায পড়তে এসেছি এর কারণ আল্লাহ্ তাআলার যেসব কল্যাণ জুমুআর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে আমরা যেন সেসব কল্যাণের অধিকারী হতে পারি। এ সব কল্যাণরাজি লাভের সাথে সাথে জুমুআর পর যখন আমরা আল্লাহ্ তাআলার আদেশ অনুযায়ী পার্থিব কাজের ব্যস্ততায় লিপ্ত হতে থাকি তখন যেন এ দোয়া ও পণ করে বের হই যে, আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করা থেকে আমরা কখনো বিরত হব না এবং ইবাদতের অবশিষ্ট আবশ্যিক বিষয়সমূহও শর্তানুযায়ী পরিপূর্ণরূপে পালন করার চেষ্টা করব। আজকের জুমুআ পড়ে

মসজিদ থেকে বের হওয়াটা যেন আগামী সপ্তাহে আগত জুমুআকে স্বাগত জানানোর জন্য একটি ব্যকুলতা সৃষ্টিকারী হয় এবং হবে। আমাদের জন্য এমন কোন জুমুআতুল বিদার প্রয়োজন নেই যেটি রমযান মাসের শেষ জুমুআ হয়ে থাকে আর যা বছরে মাত্র একবার এসে থাকে। আল্লাহ্ তাআলাকে যারা সত্যিকার অর্থে ভয় করে না তারা ভুলে যায় বছরে আরো একান্ন-বায়ান্নটি জুমুআ রয়েছে আর সেগুলোকেও সেভাবেই স্বাগত জানানো প্রয়োজন যেভাবে রমযান মাসের শেষ জুমুআকে স্বাগত জানানো প্রয়োজন। কাজেই আজকের এই রমযানের শেষ জুমুআ যেন আমাদেরকে এবং বিশেষ করে যারা সারা বছর জুমুআর নামায পড়ার ক্ষেত্রে অলসতা দেখিয়েছে তাদেরকে এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয় যে, আজকের এই জুমুআয় আমরা এ অঙ্গীকার করছি, রমযান মাসের এই জুমুআকে বিদায় জানিয়ে আগামী বছর (রমযানে) আগত জুমুআকে স্বাগত জানাব না বরং আগামী সপ্তাহে আগত জুমুআকে স্বাগত জানাব। কিন্তু কখনো যেন এমন না হয়, জুমুআর নামায পড়ে বের হওয়ার পর আমরা যেন আমাদের মন্দ (অভ্যাস), দূর্বলতা, অজ্ঞতা ও অলসতাকে একদম ভুলে না যাই বরং আমরা যেন এগুলোকে সর্বদা মনে রেখে আমাদের সংশোধনের প্রতি অগ্রগামী হই। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে আমি এটা আশা রাখি, এই রমযান মাসে বায়তুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর নামাযে আমরা যেভাবে নামাযীর উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি সেভাবে পৃথিবীব্যাপী আমাদের প্রতিটি মসজিদেও তেমন উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি এ দোয়াও করি যে, আলাহ্ এমন করুন যেন জুমা'তে আসার উত্তম মনোভাব সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্রতিটি আহমদীকেও এজন্য দোয়া করা উচিত। এ যুগে প্রতিটি আহমদীর ওপর এটি একটি অনেক বড় দায়িত্ব কেননা আমি যে আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেছি তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়। এগুলো সূরা জুমুআর শেষ রুকুর আয়াত। একে শুরুই করা হয়েছে এভাবে, **ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানু** অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছো! যখন জুমুআর জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমাদের কেবল একটিই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আর তা হল জুমুআর নামায পড়তে হবে। এখন বাকী সব কর্মকান্ডের মূল্যায়ন সামনে এসে গেছে। এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতকে যদি দেখেন তবে দেখবেন, এতে সেই ইহুদিদের উল্লেখ রয়েছে যাদের ওপর তোওরাত অবতীর্ণ হয়েছিল। যারা এর শিক্ষার ওপর আমল করেনি এবং এর সাথে সাথে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) কে অস্বীকার করেছে। তাদের অস্বীকার করাটা অনিবার্য ছিল। কেননা যেভাবে আমি বলেছি তারা এর (তৌরাতের) শিক্ষা ভুলে গিয়েছিল, এর ওপর আমল করা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং এর অনেকগুলো ব্যাখ্যা উপস্থাপন করত। আল্লাহ্ তাআলা এ সুরাতেও এভাবে বলেছেন, এর কারণ (তারা এর ওপর) আমল করা বন্ধ করে দিয়েছে, তাদের অবস্থা এমন যেন গাধার পিঠে বই-এর বোঝা তুলে দেয়া হয়েছে। যাইহোক, তাদের জন্য নির্ধারিত ইবাদতের বিশেষ দিন যা প্রতি সাত দিন পর পর আসত তা তারা ভুলে গিয়েছিল। *সাবাত*-এর দিন তাদের জন্য বিশেষ দিন ছিল তাতে তারা এমন ধরণের কিছু আচরণ করেছিল যা আল্লাহ্ তাআলার নিকট অপছন্দনীয় ছিল। শনিবারকে সাবাত বলা হয় এছাড়াও এর আরো কিছু অর্থ রয়েছে। যেমন ইবাদতের বিশেষ দিন। যাই হোক, ইহুদিদের জন্য শনিবার সাবাতের দিন খুব কল্যাণমন্ডিত ও বিশেষ ইবাদতের দিন ছিল। যেভাবে আমি বলেছি, এতে তাদের ওপর কিছু বাধ্যবাধকতাও আরোপ করা হয়েছিল সেগুলোকে তারা তাদের চতুরতার মাধ্যমে ভঙ্গ করেছিল। এ সম্পর্কে কুরআন করীমে এভাবে উল্লেখ রয়েছে, **ওয়া লাকাদ আলিমতুমুল্লাযিনা তাদাও......**অর্থাৎ এবং সাবাতের সম্বন্ধে যারা বাড়াবাড়ি করেছিল তাদের সম্পর্কে তোমরা জেনে গেছ। আর তাদেরকে তাদের বাড়াবাড়ির জন্য শাস্তিও দেয়া হয়েছে। এ সূরাতে সেই দিশেহারা ইহুদিদের উলেখ করার পর **ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানু** বলে মুসলমানদেরকে এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তোমাদেরকে জুমুআর দিনের রীতি-নীতি মেনে চলতে হবে। এখানে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, তোমরা যদি এ দিনটির রীতি-নীতি সঠিকভাবে পালন না কর তবে তোমরাও শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধি সাব্যস্ত হতে পার। প্রতিটি জাতির মত মুসলমানদের জন্যও সাবাতের দিন রয়েছে। আমাদের সাবাত শুক্রবার। তাই প্রতিটি মুসলমানের এ দিনটিকে বিশেষভাবে *হিফাযত* ও এর রীতি-নীতি সঠিকভাবে পালনের চেষ্টা করা ও (এ জন্য) দোয়া করা উচিত। এর রীতি-নীতি পালনের পন্থা হল, মুমিনদেরকে যখন জুমুআর নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তাদের উচিত তারা যেন তাদের সব কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য তাড়াতাড়ি গুটিয়ে ফেলে মসজিদের দিকে তাৎক্ষণিক ভাবে রওয়ানা দেয়। ইমামের খুতবা শোনার জন্য মসজিদের দিকে তাৎক্ষণিকভাবে যাওয়া উচিত। এখন যদি কেউ বাহানা করে বলে এ দেশে অথবা বর্তমানে পৃথিবীর (সব স্থানে) তো আমরা আযান শুনতে পাই না। এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য উত্তর হল, এ যুগে আল্লাহ্ তাআলা অন্য আরো ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, ঘড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বর্তমানে তো মানুষ ফোনের রিং টোনের পরিবর্তে বিভিন্ন আওয়াজ রেকর্ড করে যা বাজে এবং শোনা যায়। বিশেষ বিশেষ সময়ে আযানের ধ্বনি এলার্ম হিসেবে শোনা যায় কিনা এটা আমার জানা নেই আর যদি এটা সম্ভব হয় তবে আযানের ধ্বনি-সমূহ রেকর্ড করা উচিত। এ থেকে দুই

ধরণের সুফল পাওয়া যবে বরং আরো বেশি সুফল পাওয়া যেতে পারে। জুমুআর সময় আযান যেখানে তাকে (অর্থাৎ ফোনের মালিককে) জুমুআর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করবে সেখানে আশ-পাশের লোকদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট করবে। যারা এটা শুনবে তাদের জন্য এ আযানের ধ্বনিসমূহ মনোনিবেশের কারণ হবে। এটিও তবলীগের রাস্তা খোলার মাধ্যমে পরিণত হবে। যাইহোক, শুধুমাত্র এলার্মের আওয়াজ হিসেবে স্মরণ তো করাতে পারবে। কাজেই জুমুআর নামাযের গুরুত্বকে কখনোই উপেক্ষা করা উচিত নয়। এ প্রেক্ষিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) বর্তমান যুগের জন্য শতভাগ যুগোপযুগি ও সঠিকরূপে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন তা হল, এ যুগে **ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানু** এর অর্থ কেবল সেই জাতি-ই হতে পারে যারা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে মান্য করেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এর অর্থ সাধারণ মুসলমানও। কিন্তু এ সূরাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর যুগের সাথে জুমুআর নামাযের গুরুত্বকে সম্পৃক্ত করা বিশেষভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর মান্যকারীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যান্য অ-আহমদী মুসলমানরা তো নিজেদেরকে মুসলমান, মুমিন ও ঈমান আনয়নকারী বলার পরও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে অস্বীকারের কারণে– **'আফা তু'মিনুনা বায়াযাল কিতাবে ওয়া .....** অর্থাৎ তোমরা কি কিতাবের একাংশের প্রতি ঈমান রাখ এবং অন্য অংশের অস্বীকার কর?'– এর সত্যায়নকারী বলে সাব্যস্ত হয়। অতএব প্রকৃত মুমিন তারা-ই যারা কুরআন করীমের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত (বিদ্যমান) প্রতিটি আদেশের ওপর ঈমান রাখে এবং হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) পর্যন্ত সমস্ত নবীগণের প্রতি ঈমান রাখে। তাই এটি আমাদের জন্য অনেক বড় দায়িত্ব, আমরা যেন এ দিনটির বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান হই ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করি। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর যুগের এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সব ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। স্টক মার্কেটের মাধ্যমে পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের উত্থান পতনের বিষয়টি জানা যায়। যারা এ কাজে নিয়োজিত বা (এ কাজ) করে থাকে তারা বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের উত্থান পতন দেখে ব্যবসা করতে থাকে আর তারা এতটাই ব্যস্ত থাকে যে, সেই ডাকে সময় অর্থাৎ রেটের উত্থান-পতনের সময় এক মুহূর্তের জন্য তাদের পলক ফেলা বা অন্যমনস্ক হওয়া তাদেরকে লক্ষ কোটি বা হাজার কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন করে দেয়। বাজারের ছোট ব্যবসার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এ সব ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত সব লোক, হোক সে বেতনভোগী কর্মচারী। তারা ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে (এতো বেশি সক্রিয় যে) পূর্বে কখনো কোন যুগে এত বেশি (সক্রিয়) ছিল না। মসীহ মাওউদ (আ.) এর যুগে তারা যতটা সুসংগঠিত হয়েছে (কখনো)এত বেশি ছিল না। এতে(অর্থাৎ ব্যবসায়ীক ক্ষেত্রে) প্রতি দিন অধিক হারে ইলেক্ট্রনিক উপকরণ ব্যবহৃত হওয়ার কারণে ব্যবসায়ীক ক্ষেত্রে সময়ের গুরুত্বও বেড়ে চলেছে। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, ব্যবসা যত বড়ই হোকনা কেন, তোমাদের কাছে যতই সময় স্বল্পতা থাকুন না কেন জুমুআর নামাযের বিপরীতে এর কোন মূল্য নেই। তোমরা তোমাদের সম্ভাব্য সমস্ত ক্ষতিকে পিছনে ফেলে সময় বের করে জুমুআর নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। ছোট খাটো ব্যবসায়ীদের জন্য তো বাহানা তৈরীর কোন সুযোগই নেই। কাজেই আজ আমরা আহমদীরা হচ্ছি সেই মু'মিন যাদেরকে তাদের জুমুআর নামায সঠিকভাবে পড়তে হবে। (যদি এমনটি করি) তখনই আমরা এ যুগের পথপ্রদর্শকের পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবো এবং তখনই আমরা আল্লাহ্ তাআলার কল্যাণরাজি লাভ করতে থেকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী বলে সাব্যস্ত হতে পারবো। দেখুন! জুমুআর নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.) আমাদেরকে কিভাবে বলেছেন এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের থেকে কিভাবে আমাদেরকে পৃথক করে দেখিয়েছেন? এ বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে তিনি (রা.) হযরত রাসূলে করীম (সা.) কে এটা বলতে শুনেছেন যে, কিয়ামতের দিন আমরা **আখেরীন** (পরবর্তীতে আগমনকরী) হওয়া সত্ত্বেও **সাবেকীন** (পূর্বে অবস্থানকারী) হবো। যদিও তাদেরকে পূর্বেই কিতাব দেয়া হয়েছিল। এরপর হল তাদের সেই দিন (অর্থাৎ সাবাতের দিন) যা তাদের ওপর ফরয করা হয়েছিল আর তারা (এ বিষয়ে) মতবিরোধ করেছে কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এদিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দান করেছেন। এখন মানুষ আমাদের পিছনেই চলবে। ইহুদিরা একদিন পর এবং খ্রিস্টানরা পরশু। এ হাদিসটি বুখারী শরীফের কিতাবুল জুমুআর ফার-যুল জুমুআ বাবে রয়েছে। এ হাদিসটি এমন যে এর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এই প্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্তভাবে শুধু এতটুকু বলছি, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এর যুগে জামা'তের মাঝে এ কাজের দায়িত্বভার হযরত ওয়ালী উল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল।

তখন এ কিতাবের কিছু খন্ড প্রকাশ হয়েছিল। আর পরে এক দীর্ঘকাল এটা প্রকাশ হয়নি। এখন কয়েক বছর হলো আমি নূর ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছি। এর তত্ত্বাবধানে আঁ হযরত (সা.) এর হাদিসের কিতাবের প্রকাশের কাজ জামা'তে হচ্ছে। মুসলিম শরীফের কয়েক খন্ড ও বুখারী শরীফের কয়েক খন্ড প্রকাশ হয়েছে। মোট কথা শাহ সাহেব যার ব্যাখ্যা লিখেছেন এগুলো এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে

এর দ্বারা হাদিসের অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে।

শাহ সাহেব দীর্ঘ ব্যাখ্যায় জুমুআর নামায ফরয হওয়ার আবশ্যকতা, ও গুরুত্বের ব্যাপারে কিছু ফিকাহবিদ যারা জুমুআর নামাযকে *ফরযে কিফায়া* মনে করতেন, তাদেরকে এলযামি ও ভাষার তত্ত্বজ্ঞান রীতির অলোকে উত্তর দেবার পর এটাকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। ফরযে কিফায়া হলো এমন ফরয যা কয়েকজন আদায় করলে সবার আদায় হয়ে যায়। তিনি দেখিয়েছেন এটা ফরযে কিফায়া নয় বরং এটা ফরয। তেমনি ফরয যেভাবে নামায ফরয।

তারপর **সাবাত** শব্দের শাব্দিক বিশেষণ করেছেন। আর ইহুদীদের ইতিহাস থেকে এটা দেখিয়েছেন জুমুআর দিনই ইহুদীদের সাবাতের দিন ছিল। অথবা এর কিছু অংশ তার অর্ন্তভূক্ত ছিল। পরে এটা শনিবারে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

তাই শাহ সাহেবের যে ব্যাখ্যা এর কিছু অংশ এর সম্পর্কে উপস্থাপন করছি। **লিসানুল আরব** অনুসারে **সাবাত** শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো-কাজ কর্ম ত্যাগ করে বিশ্রাম করা। আর পরিভাষাগত অর্থ হলো- সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া।

বনী ইসরাইলের জন্য 'একদিন' সারাদিন ইবাদতে ব্যস্ত থাকার নির্দেশ ছিল। যার উল্লেখ আয়াত নম্বর-১৪-১৬ বুরুজ অধ্যায়ে পর্যন্ত অপর অন্যান্য জায়গাতেও–*খুরুজের আহবারেও* রয়েছে। মোট কথা- জুমুআর দিনে মুসলমানদের জন্য তেমন বাধ্যবাধকতা নেই যেমন বণী ইসরাইলের জন্য ছিল। আলাহ তাআলা কুরআন মজীদে এ সাচ্ছন্দ্যতার বর্ণনা এভাবে দিচ্ছেন-

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٥﴾

(সূরা নাহাল ১২৫ নম্বর আয়াত)

দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে এই সাবাতের দিনে ইবাদতের শিক্ষা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল যারা এ বিষয়ে পূর্বে মতভেদ করেছে।

এ আয়াতের অর্থ–এমন সপ্তম দিন শনি বার ছিল। সারা জীবন এক সাথে থেকে শনিবারকে যদি রবিবারে পরিবর্তন করতে পারে তাহলে ইহুদীদের জন্য এটা অসম্ভব ছিল না শুক্রবারকে শনিবার বানিয়ে নেয়া।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এ বিষয়ের সত্যায়ন করে। ইহুদীরা নিজেদের নির্বাসনের দিনগুলোতে বেবিলিনিয়দের ও পারস্যবাসীদের মাঝে দীর্ঘ সময় কাটানোর ফলে তাদের শিরকী বিশ্বাস ও রীতি নীতিকে নিজেদের মাঝে আত্মস্থ করে নিয়েছিল। আর ঐ মুশরেক জাতিগুলোর প্রভাবে তাদের ধর্মীয় মূলনীতিতে পরিবর্তন এসেছে। কোন এক সময় শুক্রবার ইহুদীদের নিকট পবিত্র ছিল। সুতরাং রোমানী বিধিবিধান ও আইন কানুন এক ঐতিহাসিক দলীল, তাতে স্পষ্ট লেখা আছে শুক্র ও শনিবার এই দু'দিনই আইন গত ভাবে এটা নিষিদ্ধ ছিল ঐ দিনগুলোতে কোন ইহুদীকে যেন বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করা না হয়। জুমুআর নামই ইব্রানীতে সাবাত রাখা হয়েছিল। আর সাবাতের প্রস্তুতি শুক্রবার অস্ট প্রহরে অর্থাৎ প্রায় আড়াইটার সময় শুরু হতো যখন কোন কুরবানী উপস্থাপিত হতো। আর সাড়ে তিনটার পর এটা শেষ হতো কুরবানী দেয়ার মধ্য দিয়ে। এরপর ইহুদীরা কাজকর্ম থেকে অব্যাহতি নিয়ে, গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরে শনিবারকে স্বাগত জানাতো।

এটা থেকে প্রমাণ হয় জুমুআর দিনও তাদের নিকট কিছুটা সাবাতের মর্যাদা রাখতো। এজন্য ইসলামী ইতিহাসবিদগণ এ বর্ণনাকে নিজেদের মাঝে রেখেছেন জুমুআর দিন যা প্রাচীন **আরজে আরোবা** ছিল তা আহলে কিতাব থেকেই নেয়া হয়েছিল। পরে তারা লিখছেন **আরোবা** এর নাম ইহুদীদের মাঝেও পাওয়া যায়। আর সাবাতের ইবাদত শুক্রবার থেকেই শুরু হয়। আর পর্যালোচনান্তে এ ফলাফল নিশ্চিত ভাবে আসে যে, ইহুদীরা সাবাতের বিধানাবলীর বিষয়ে ঘোর থেকে ঘোরতম মতবিরোধ সৃষ্টি করে নিয়েছিল। এমনকি তাদের অনেক নবী তো তাদের অপমান ও অপদস্তের কারণও এই সাবাতের দিনের অসম্মান প্রদর্শনকেই করেছেন।

সাবাতের অসম্মান বনী ইসরাইলের ধ্বংসের কারণ হবে–হযরত মুসা (আ.) এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বাইবেলে লেখা রয়েছে।

এই সব বর্ণনা ও সাক্ষ্য, আঁ হযরত (সা.) বর্ণিত হাদিসের সত্যায়ন করে। এ দিন তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছে, আর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর প্রতি মনোযোগী করার মধ্য দিয়ে পথ প্রদর্শন করেছেন। আর আজ পর্যন্ত **১৫**শ বছর অতিক্রমের পরও মুসলমান যেমনই হোক, কোন না কোনভাবে জুমুআর সম্মান করে। সংখ্যায় কম হোক, সারা শহরবাসী একত্রিত না হোক, কিন্তু তবুও জুমুআতে তারা অবশ্যই আসছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত জুমুআ হতে থাকবে ততক্ষণ কল্যাণ পেতেই থাকবে।

আর এ যুগ, যেভাবে আমি বলেছি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর যুগের সাথে এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে আর আহমদীদেরকে বিশেষভাবে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। যেভাবে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন সেভাবে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা এর পথ প্রদর্শন করেছেন। তাই আমাদের এটা প্রথম দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার এ আদেশ পালনের জন্য আমরা যেন বিশেষ গুরুত্ব দেই। এই আদেশের পরিপন্থী কোন কাজ করে আল্লাহ তাআলার শাস্তির লক্ষ্যস্থলে যেন পরিণত না হই। আল্লাহ্ তাআলা পুরাতন

নবীদের জাতির দোষক্রুটি–ইহুদীদের দোষক্রুটিগুলো এজন্যই বর্ণনা করেছেন যেন আমরা সর্তক থাকি।

জুমুআর দিন যেভাবে শাহ সাহেব ইতিহাস থেকে প্রমাণ করেছেন ইহুদীদের বিশেষ ইবাদতের শুরু এ দিন থেকেই হয়েছিল। তবুও তাদের এ দিনকে ত্যাগ করারই ছিল।

এ দিনের গুরুত্ব মহানবী (সা.) এর হাদিস থেকে প্রমাণিত। এ দিন ইহুদীদের এ জন্যই পরিত্যাগ করার ছিল কেননা এ দিন আল্লাহ তাআলার ঐশী পরিকল্পনা মহানবী (সা.) ও তাঁর উম্মতের জন্য নির্ধারণ করার ছিল। মহানবী (সা.) এ দিনের গুরুত্ব সুস্পষ্ট করে বলেছেন।

এ দিন আমাদের জন্য কেন গুরুত্ব পূর্ণ? এ জন্য যে–এদিন হযরত আদম (আ.) এর জন্ম ও মৃত্যুর দিন। আর হযরত আদম (আ.) আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনায় এক বিশেষ অগ্রনী ভূমিকা রেখেছেন। যার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আর পরে মসীহ মাওউদ (আ.) এর যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে আল্লাহ তাআলা আদম নাম দিয়েছেন। এ যুগে ধর্মীয় জীবন তাঁর সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

সুতরাং আহমদীদের জন্য জুমুআর সম্মান প্রদর্শন করা এক অতি আবশ্যকীয় বিষয়। তাহলেই আমাদের সেবা সঠিক হবে। আমরা এর বরকত থেকে সর্বদা কল্যাণ লাভ করতে থাকবো, যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জামাতের সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

আঁ হযরত (সা.) ‘জুমুআর দিন’ এর গুরুত্বের বিষয়ে বলেন, কিছু হাদিস উপস্থাপন করছি-

হযরত আওস বিন আওস (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- তোমাদের দিন গুলোর মধ্যে সবোর্ত্তম দিন জুমুআর দিন। এতে হযরত আদমের জন্ম হয়েছে আর এ দিনেই মৃত্যু হয়েছে। এ দিনই শিঙ্গায় ফু দেয়া হবে। আর এ দিনেই বেহুঁশ অবস্থা গ্রাস করবে। সুতরাং এ দিনে অধিক হারে আমার প্রতি দুরুদ প্রেরণ কর। কেননা এ দিন তোমাদের এ দুরুদ আমার সামনে উপস্থাপন করা হবে। আবার ইবনে মাযার অন্য একটি হাদীস, এটি হযরত আবু লুবাকা বিন মুনজেদ বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন-

জুমুআর দিন-দিনের সর্দার। আর আল্লাহ তাআলার নিকট সবচে’ বেশি সম্মানিত। এটা আল্লাহ তাআলার নিকট ঈদুল আযহিয়া ও ঈদুল ফিতরের চেয়ে অগ্রগণ্য। এই দিনের পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা এ দিনে হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত এদিনে আল্লাহ তাআলা হযরত আদমকে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করান। তৃতীয়ত এ দিনে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম কে মৃত্যু দেন। চতুর্থত এ দিনে এক মুহূর্ত এমন আসে সেখানে বান্দা হারাম জিনিস ব্যতীত যা-ই চায়, তা তাকে দেন। পঞ্চম এদিনে কিয়ামত হবে।

পাহাড়, সমুদ্র ও ভূমি এ দিনকে ভয় করে।

এই হাদিসগুলো থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হলো-এ দিনের কত গুরুত্ব! যেভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন- এদিন অধিক হারে আমার প্রতি দুরূদ প্রেরণ কর। প্রত্যেক জুমুআতেই দুরূদ অধিক হারে পড়া উচিত। কেননা দোয়ার কবুলিয়্যতের বিষয়টি মহানবী (সা.) এর প্রতি দুরূদ প্রেরণের সাথে খুবই সম্পর্ক যুক্ত। কুরআন করীমে খোদা তাআলা এটা বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(সূরা আহযাব ৫৭ নম্বর আয়াত)

আল্লাহ নিজের বান্দার উপর রহমত বর্ষণ করেন। তাঁর ফিরিশতারাও। আর হে তোমরা যারা ইমান এনেছ! তোমরা এ নবীর উপর দুরুদ ও সালাম প্রেরণ করতে থাক।

সুতরাং যেভাবে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- এর মধ্যে এক এমন মুহূর্ত আসে যেটা দোয়া কবুলিয়্যতের মুহূর্ত। দুরুদ শরীফ প্রেরণের যে দোয়া আমাদেরকে খোদা তাআলা শিখিয়েছেন, এ দোয়া যদি আমরা করি, তাহলে এ দুরূদের বরকতে আমাদের অন্যান্য সময়ে করা দোয়াগুলো গ্রহনযোগ্যতার মর্যাদা পাবে।

দুরূদ প্রেরণ করার যে দোয়া খোদা তাআলা শিখিয়েছেন, আমরা এ দোয়া করলে অন্যান্য সময় আমরা যেসব দোয়া করি তা গ্রহণীয় হওয়ার মর্যাদা লাভ করবে। সুতরাং জুমুআর দিন দুরূদ পাঠ করার ব্যাপারে আমাদের বিশেষ মনযোগী হওয়া প্রয়োজন। মুসলমানদের উপর এটা আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ যে তিনি জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের পর জাগতিক কাজকর্মে নিয়োজিত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অন্যান্য কাজ বাদ দিয়ে সারা দিন ইবাদতের কথা বলেন নি। কিন্তু শর্তসাপেক্ষে এ অনুমতি দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলার যিকর (স্মরণ) থেকে বিস্মৃত হয়ো না। আর দ্বিতীয়টি , আল্লাহ্ তাআলার কৃপা অন্বেষণ করতে হবে আর তাকে স্মরণ করতে হবে।

খোদা তাআলার এই নির্দেশ যে, আমার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর, এ কথা মাথায় রেখে আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যখন জাগতিক কাজকর্মে নিয়োজিত হবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় একথাও থাকবে যে আমার কোন কাজ যেন শুধু মাত্র জাগতিক লোভ লালসার কারনে না হয়, আমার কাজকর্ম, চাকুরী, ব্যবসাবানিজ্য ঐ নীতির উপরে যেন হয় যা তাক্ওয়ার দিকে অগ্রগামী করে। আমি কখনো যেন এ ধারণা না করি যে যেহেতু এটি জাগতিক কাজ, তাই এতে ছল-চাতুরী

বৈধ। না, বরং যেহেতু খোদা তাআলার কৃপা অন্বেষণ করা উদ্দেশ্য, তাই আমাদের প্রত্যেকটি বিষয় পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলাকে বেশী বেশী স্মরণ কর। এদ্বারা একেতো এটা স্মরণ থাকবে যে আমাকে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতের হেফাযত করতে হবে। আর দ্বিতীয়ত এটাও স্মরণ থাকবে যে, আমার কাজকর্ম ভাল হচ্ছে এবং আমি কাজকর্মে সফলকাম হচ্ছি শুধু এ কারণে যে, খোদা তাআলার সত্তার উপর আমার পূর্ণ ভরসা রয়েছে।

অত:পর শেষ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, খোদা তাআলার সত্তাই প্রকৃত রিযিকদাতা, কাজ কর্মে সমৃদ্ধিলাভ হলে তা কেবলমাত্র খোদা তাআলার অনুগ্রহের কারণেই। যদি তোমার কোন পরিচিতি লাভ হয়ে থাকে,তবে তা কেবলমাত্র খোদা তাআলার কৃপার মাধ্যমেই হয়েছে।

সুতরাং শেষ যুগে, যদি মসিহ মাওউদ (আ.) কে মেনে থাক,তবে জাগতিক লোভ লালসা ও ক্রীড়া কৌতুক থেকে তোমাদের অনেক দূরে থাকা প্রয়োজন। যদি তোমারা এ গুলোকে দূরে নিক্ষেপ না কর, তাহলে তোমাদের অবস্থা হবে, মসিহ মাওউদ (আ.) এর সাথে এ শর্তে, আমি আমার প্রাণ, সম্পদ ও ইজ্জত কুরবাণী করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকব, বয়আত করার পর মসিহ মাওউদ (আ.) কে নি:সঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দিলে আর মসিহ মাওউদ (আ.) যে উদ্দেশ্যে তোমাদের একত্রিত করেছেন,এক জামা'ত বানিয়েছেন, তা ভুলে গেলে। ভুলে গেলে যে, খোদা তাআলার সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও তাঁর স্মরণ দ্বারা জীবন সাজাতে হবে আর আল্লাহর সৃষ্টির হক আদায় করতে হবে। শেষ যুগে প্রেরিত আঁ হযরত (সা.) এর সত্যিকার প্রেমিকের সাথে তোমাদের সম্পর্ক কোন সীমা পর্যন্ত রয়েছে–তা পরীক্ষা করার জন্য আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকার সমূহ পালনের জন্য তোমরা কোন সীমা পর্যন্ত প্রস্তুত আছ তা পরীক্ষার জন্য আল্লাহ্ তাআলা যে মানদন্ড নির্ধারণ করেছেন, তা হচ্ছে জুমুআয় তোমাদের উপস্থিতি।

সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা এটা স্মরণ রাখা উচিত, জুমুআর জন্য মসজিদে আসা অথবা মসজিদ না থাকলে কিছু সংখ্যক আহমদী কোন জায়গায় একত্রিত হয়ে জুমুআ পড়া অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং শুধু রমযানের শেষ জুমুআ বা অন্যান্য জুমুআ যেন মসজিদে অধিক উপস্থিতির প্রদর্শন-কেন্দ্র না হয়। বরং সারা বছরই যেন জুমুআর দিন মসজিদগুলো নামাযী দ্বারা ভরপুর থাকে।

জুমুআর গুরুত্ব সম্বন্ধে এখন আমি কিছু বিস্তারিত হাদিস পেশ করছি। যদ্বারা জুমুআর কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণা লাভ হয়। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করেছেন, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে, তার উপর জুমুআর দিন জুমুআ পড়া ফরয করা হয়েছে, কেবল অসুস্থ, ভ্রমণকারী, নারী, বাচ্চা ও দাসগণ ব্যতিরেকে। যে ব্যক্তি খেল-তামাশা ও ব্যবসা বানিজ্যের কারণে জুমুআর ব্যাপারে উদাসীন হবে, আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে তাকে উপেক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসার অধিকারী।

অপর আরেকটি হাদিসে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, জুমুআর দিন পুণ্যের প্রতিদান কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। সুতরাং জুমুআর দিন জুমুআর নামায ছাড়াও যথাসম্ভব সকল প্রকার পূণ্য কাজ যেন করা হয়। এর প্রতিদান আল্লাহ তাআলা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন।

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ উপেক্ষা করে কোন পুণ্য অর্জিত হতে পারে না। আর সেই নির্দেশ যা অতি আবশ্যকীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভূক্ত,তার ব্যাপারে তো কোন কথাই নেই। সুতরাং জুমুআর নামাযে আসা পুণ্যে অগ্রগামী হওয়ার সবচাইতে বড় মাধ্যম স্বরূপ ।

আর এটিই মুনাফেক ও মু'মিনের পরিচয় প্রদান করে। যেমন একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনা কারনে জুমুআয় অনুপস্থিত থাকে, আমল নামাতে তাকে মুনাফেক লেখা হবে, যা মোছাও যাবে না, পরিবর্তনও করা যাবে না।

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু জার জামরী (রা.)বর্ননা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি অলসতা পূর্বক লাগাতার তিন জুমুআ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ্ তাআলা তার হৃদয়ের উপর মোহর লাগিয়ে দেন। আর যখন মোহর লাগিয়ে দেন, তখন সে পুণ্য কাজ সম্পাদনের তৌফিক থেকে বঞ্চিত হয়। আর ধীরে ধীরে মানুষ নেকী থেকে অনেক দূরে চলে যায়।

হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে ও নিজ সামর্থানুসারে পবিত্রতা অবলম্বন করে, আর তেল ও সুগন্ধী লাগিয়ে ঘর থেকে বের হয় আর দু ব্যক্তিকে পৃথক করে না (অর্থাৎ নিজে বসার জন্য জোরপূর্বক দু'জনকে দূরে সরায় না) অত:পর তার উপর আবশ্যকীয় নামায আদায় করে, অত:পর ইমাম যখন খুতবা প্রদান করে তখন নীরবে তা শ্রবণ করে, তখন তার ঐ জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বর্ণনা করেছেন, জুমুআর দিন ফিরিশতা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে যায়। অত:পর সর্বপ্রথম আগমন কারীকে সে প্রথম আগমনকারী হিসেবে

লিখে। আর প্রথম আগমন কারীর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে উট কুরবানী করে। এরপর আগমনকারীর দৃষ্টান্ত গাভী কুরবানীকারীর ন্যায়। এরপর আগমনকারীদের দৃস্টান্ত যথাক্রমে বাছুর, ভেড়া , মুরগী ও ডিম কুরবানী কারীর ন্যায়। অত:পর যখন ইমাম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে যান, তখন ফিরিশতা তার রেজিষ্ট্রার বন্ধ করে নেয় আর ইমামের খুতবা শোনা আরম্ভ করে। এ হাদিসে জুমুআয় যথাসময়ে আসার সওয়াব ছাড়াও খুতবা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করার ব্যাপারেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে মজলিসে আল্লাহ্‌র ফিরিশতা বসে কথা শ্রবণ করে, তার চাইতে বরকতময় মজলিস আর কোনটি হতে পারে?

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ইমামের খুতবা চলাকালীন সময়ে কথা বলে, তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় আর যে কাউকে বলে, 'চুপ থাক' সেও জুমুআ থেকে বঞ্চিত হবে। অর্থাৎ কথায় লিপ্ত ব্যক্তিকে চুপ করানোর জন্য কথা বলাও নিষেধ। যদি কোন ছোট বাচ্চা চিৎকার করে, তবে সেখান থেকে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। আর কোন সাবালক বাচ্চা যদি কথা বার্তা বলে, তবে তাকে ইঙ্গিতে চুপ থাকতে বলতে হবে।

হযরত জারের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, জুমুআর দিন সুলায়েব গাতফানী এমন সময় এসে বসে গেল যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) খুতবা প্রদান করছিলেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, হে সুলায়েব, তুমি দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামায আদায় কর আর সংক্ষিপ্ত কর। অত:পর তিনি এ সম্বন্ধে বলেন যখন তোমাদের কেউ জুমুআর দিন খুতবা চলাকালীন সময়ে আসে, সে যেন দু'রাকাত নামায পড়ে আর জলদি জলদি তা সম্পন্ন করে।

আলকামা বর্ণনা করেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) এর সাথে জুমুআর উদ্দেশ্যে যাই। তিনি দেখলেন, তার পূর্বে তিন ব্যক্তি মসজিদে পৌঁছে গেছে। তিনি বললেন, চতুর্থ ব্যক্তি আমি। অত:পর বললেন, চতুর্থ হওয়াও খারাপ নয়। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, লোকেরা কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার সমীপে জুমুআয় আসার ভিত্তিতে বসা থাকবে। অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ। আর চতুর্থ বেশী দূরে নয়। এটা হচ্ছে জুমুআর গুরুত্ব।

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত সামুরা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জুমুআর নামাযে আস আর ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বস। এক ব্যক্তি পিছনে থাকতে থাকতে জান্নাত থেকেও পিছনে পরে যায়, অথচ সে জান্নাতী।

মানুষ পুণ্য কাজ করে থাকে। কিন্তু জুমুআ না পড়ার কারণে, হৃদয়ে দাগ লাগার কারণে সেই নেকী ধীরে ধীরে নি:শেষ হয়ে যেতে থাকে। অত:পর ঐ ব্যক্তিই যেভাবে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, জান্নাতের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও জান্নাত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত উবায়েদ বিন সাবাত বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক জুমুআর দিন বলেন, হে মুসলমানগণ নিশ্চয় এ দিনকে খোদা তাআলা তোমাদের জন্য ঈদের দিন বানিয়েছেন, আর যার নিকটই সুগন্ধি থাকে, সে যেন তা লাগায় আর মিসওয়াক করে।

সুতরাং জুমুআর এ গুরুত্বকে আমাদের সর্বদা সম্মুখে রাখা উচিত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ দিনের গুরুত্বকে আরেক ভাবে বর্ণনা করেছেন অত:পর জুমুআর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) কুরআন করীমের আয়াত, **"আনইয়াওমা আকমালতুলাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নে'মাতি"** এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, মূলত: এ আয়াতটি দু'টি দিক বর্ণনা করে। এক, তোমাদের পবিত্র করা হয়েছে এমন দিন এসেছে যে, তোমাদের পবিত্র করে দেয়া হয়েছে দ্বিতীয়ত কিতাব পরিপূর্ণ, করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়, জুমুআর দিন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিন হযরত ওমর (রা.)-কে কোন ইহুদী বলল, আসুন ঈদ উদযাপন করি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, জুমুআ ঈদই। আরেক বর্ণনায় এসেছে, ইহুদী বলেছে আমাদের উপর এ আয়াত অবতীর্ণ হলে আমরা ঈদ উদযাপন করতাম। হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) বলেন, কিন্তু অনেক লোক এই ঈদ সম্বন্ধে অনবহিত। অন্য ঈদে কাপড় বদলায়। অথচ এ ঈদের ব্যাপারে উদাসীন। আর সাধারণ ময়লা কাপড় পড়ে আসে। আমার নিকট এ ঈদ অন্যান্য ঈদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ ঈদের জন্য সূরা জুমুআ আর এ জন্যই কসর নামাজ। আর জুমুআ হচ্ছে সেদিন যেদিন আসরের সময় আদমের জন্ম হয়। আর এই ঈদ ঐ যুগের দিকেও ইঙ্গিত করে, যখন প্রথম মানুষের জন্ম হয়। কুরআন শরীফও এদিনই পরিপূর্ণ হয়। অর্থাৎ এ আয়াতটি **আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম....** এ দিনই অবতীর্ণ হয়। সুতরাং এক মহান মহিমান্বিত দিন আমরা পালন করি যেদিন আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণীর অবতরণ পরিপূর্ণ করেন। আর এক ইহুদীকেও এ আয়াতের তাৎপর্যের স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হল।

সুতরাং যে খোদা দ্বীন পরিপূর্ণ করে কুরআন করীম রূপে তা আঁ হযরত (সা.) এর উপর অবতীর্ণ করেন, সে খোদা-ই এক জরুরী আবশ্যকীয় বিষয়ে এ কুরআনে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব, এ বিষয়ে আমরা যেন কখনো শৈথিল্য প্রদর্শন না করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের ও আমাদের সন্তানদের এই দিনের বিশেষ মর্যাদা প্রদানের সৌভাগ্য দান করুন। আর হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) আমাদের নিকট যেরূপ প্রত্যাশা করেছেন, আমরা যেন তা পূরণ করতে পারি।

[জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত]

নেযামে নও
(নব বিশ্বব্যবস্থা)

হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাযিআল্লাহু আনহু
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা

(৮ম কিস্তি)

গোলামদের সাথে আঁ হযরত (সা.) এর উত্তম ব্যবহারের আদর্শ এবং এর কার্যকর ফল

হযরত খাদিজা *রাযিআল্লাহু আনহার* বিয়ে রাসূল করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পন্ন হয়। তিনি *রাযিআল্লাহু আনহা* তার সমস্ত ধন-সম্পদ রাসুল করীম (সা.) কে দিয়ে দেন, আরও দিয়ে দেন একান্ত ভাবে তারই নিজের সেবায় নিয়োজিত গোলাম যায়েদ (রা.)-কেও, রাসুল (সা.) সেই যায়েদ (রা.)-কে মুক্ত করে দেন। হযরত যায়েদ (রা.) প্রকৃত পক্ষে দাসপুত্র ছিলেন না। বরং মুক্ত ও স্বাধীন সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের সন্তান ছিলেন। কোন এক লুটতরাজের ঘটনাচক্রে তিনি বন্দী হয়ে যান আর এভাবে হাত বদল হতে হতে রাসুল করীম (সা.) এর কাছে পৌঁছান। যায়েদ (রা.)-এর বাবা ও এক চাচা, তারা দুজন তাকে খুঁজতে খুঁজতে মক্কায় এসে পৌঁছল আর রাসুল (সা.) এর সমীপে নিবেদন করলো যে, যায়েদ (রা.)-কে আমাদের সাথে যেতে দিন। রাসূল করীম (সা.) হযরত যায়েদ (রা.) কে পূর্বেই মুক্তি দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি (সা.) বললেন আমার পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই, যদি সে যেতে চায় তাহলে অবশ্যই চলে যাক। তারা যায়েদ (রা.) কে বললো, ব্যাটা! বাড়ী চলো, তোমার মা কান্না-কাটি করছে আর তোমাকে হারিয়ে তোমার মা গভীর মনকষ্টে ভুগছে, আর রাসূল করীম (সা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন যে, তিনিও তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন, আর অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন যে, তুমি আমাদের সাথে ফেরত চলো। যায়েদ (রা.) বললেন, তারা আমাকে অবশ্যই মুক্ত করে দিয়েছেন কিন্তু আমি মন থেকে এদেরই গোলাম হয়ে গেছি আর এই গোলামী আমি পরিত্যাগ করতে চাই না। বাবা অনেক করে বুঝালেন-শুঝালেন আর বললেন, দেখো! নিজের বৃদ্ধা মায়ের কথা ভাবো। চাচাও বহু চেষ্টা করলেন আর বললেন, মা-বাবার চেয়েও বেশি আদর যত্ন আর কে করতে পারে! আমাদের সাথে চলো। আমরা তোমাকে খুবই আদর যত্নে রাখবো। তবুও হযরত যায়েদ (রা.) বললেন, আমি আপনাদের সাথে যেতে পারি না কেননা আমার সাথে এরা যে মমতাপূর্ণ আচার ব্যবহার করেন এথেকে উত্তম কোন ব্যবহার জগতের কোন মা-বাপ করতে পারেন না।

এবারে বল! এই দাসত্বের ওপর আপত্তি করা যেতে পারে, না মানব হৃদয় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়ে উদ্বেলিত হয় আর চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে আর হতবাক হয়ে যাওয়া সেই মানব-চিত্ত ভাবে-জগতে অনাত্মীয় দুইজন মানুষের মধ্যে এমন মমতাপূর্ণ সম্পর্কও কী হয়!

ইসলামের সূচনাকালে কতিপয় ব্যক্তির গোলাম হয়ে থাকবার কারণ

তাই ইসলামের প্রাথমিক যুগে কতিপয় গোলাম যদি গোলামই রয়ে যায় তবে এর অর্থ কেবল এটাই যে মুসলমানরা গোলামদের সাথে এমন উত্তম আচরণ করতো, যাতে সেই গোলামরা নিজেরাই চাইতো আমাদের ওপর এরা কর্তৃত্ব চালিয়ে যাক আর আমরা তাদের গোলামীতেই নিয়োজিত থাকি কেননা তাঁদের গোলামী করা স্বাধীন জীবনযাপন অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেয়। তবুও ইউরোপের পাদ্রীরা দূরে বসে থেকে আপত্তি করতে থাকে যে, ইসলাম দাসত্ব প্রথাকে বিলুপ্ত করেনি। বড় বড় অনুষ্ঠানাদিতে বক্তারা যদি নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৫মিনিটও বেশি বক্তৃতা করে বসে তবে লোকেরা হৈ-চৈ করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু অন্তর থেকে করা গোলামী আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন কারীদের অবস্থা হলো এমনই যে এখানে আমাদের জলসায় তীব্র ঠান্ডাই থাকুক, শ্রোতারা ক্ষুধার্তই হোক আর হাত-পা ঠান্ডায় জমেই যাক তবুও লোকেরা জলসাগাহে বসেই থাকে আর এটাই চায় যে বক্তৃতা চলতে থাকুক। এই যে গোলামী! এটা কী এমনতর যে, এতে আপত্তি করা যায়? না এই গোলামী ঈমান বৃদ্ধিকারী সাব্যস্ত হয়। সৃষ্ট কোন বান্দার প্রতি এই গোলামী নিবেদন করা হয় না বরং খোদা তাআলার জন্যই তা নিবেদিত হয়ে থাকে।

অবশ্য কারও এমন বলার কথা নয় যে, বিশ্ব এখন এগিয়ে গিয়েছে আর সবেমাত্র দাসত্বপ্রথাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে! কেননা ইসলাম সূচনা কাল থেকেই দাসত্বপ্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করেছে।

হ্যাঁ, যুদ্ধবন্দী করার বিধান এতে অনুমোদিত রয়েছে। তবে সে ব্যাপারেও এতে এমন বিধিমালা রয়েছে যা থেকে বিশ্ব এখনও পিছিয়েই আছে। বর্তমানে মিত্রশক্তি ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া ও এদের সপক্ষ রাষ্ট্রসমূহ যেমন এই বিধিবিধান কার্যকর করতে প্রস্তুত নয় তেমনই অক্ষশক্তিও জার্মানী, ইতালি, স্পেন ও জাপান–এ বিধিবিধানের ওপর আমল করতে সম্মত নয়।

জনগণের ওপর জুলুম নির্যাতন চালিয়ে যেতে কতিপয় তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি

সংক্ষেপে বলা যায় দাসত্ব প্রথাকে ইসলাম সমূলে উৎপাটন করেছে। এবারে রইলো সেই দু:খ-কষ্ট যা প্রচ্ছন্ন গোলামী থেকে সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ দারিদ্র বা পরাধীনতার কারণে যার উদ্ভব ঘটে। এর প্রতিবিধানও ইসলাম করেছে। কিন্তু এই প্রতিবিধান সম্পর্কে জানবার পূর্বে মনে রাখা প্রয়োজন যে বিশ্বের অর্থনৈতিক বৈষম্য তত্ত্বগত কতিপয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জন্মায়। যা নিম্নরূপঃ-

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিঃ

প্রথমত কেউ কেউ বলে থাকে **‘জোর যার মুল্লুক তার’**, তাই আমাদেরও এরই ওপর আমল করা উচিত। ইংরেজরা আধিপত্য বিস্তার করে দেশের কর্তৃত্ব দখল করে নিল। একই ভাবে ইতালী আবিসিনিয়ার ওপর হামলাকালে মুসোলিনী এক বক্তৃতা করে। এতে সে বলে যে, আমরা আবিসিনিয়ার ওপর এই হামলা কেবল এজন্য করেছি যাতে আমরা আবিসিনিয়াবাসীর সেবা করতে পারি। এই পদক্ষেপে আমাদের কেবলই সেই উদ্দেশ্য রয়েছে, যা ইংরেজদের ছিল ভারতে। তারা (ইংরেজরা)বলে থাকে ভারতে আমরা এজন্য শাসনকার্য চালাচ্ছি যেন সেখানকার অজ্ঞ লোকদের পড়া লেখা শিখিয়ে উন্নতি সাধন করে উন্নত দেশের কাতারে তাদের দাঁড় করানো যায়। আমাদের মাঝে কী মানবতা বোধ থাকতে নেই, তবে আমরা অপরের সেবা করব না কেন? আর কেনই বা তাদের দেশ আমাদের শাসনাধীনে এনে তাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করব না! এটাও এক যুক্তি-প্রমাণ যা কারও কারও পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়।

দ্বিতীয় দৃষ্টি ভঙ্গিঃ

আবার কেউ কেউ বলে থাকে যে বিত্তবান যারা তাদের বিত্তশালী থাকাটাই আবশ্যকীয় অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকে যাদের প্রাধান্য রয়েছে আর যারা নিজেরা আধিপত্য বিস্তার করে উপার্জন করে থাকে, এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গিঃ

অনুরূপভাবে আরও এক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কর্তৃত্ব-প্রকৃতই এক মর্যাদার বিষয় । কোন অবস্থাতেই এর অবমূল্যায়ন করা যেতে পারে না।

এ বিশ্বাস তেমনই, হিন্দু ধর্মে যেমনটা পাওয়া যায়। শুদ্রর সন্তানেরা শুদ্রই থেকে যাবে, বৈশ্যরা বৈশ্যই রইবে, ক্ষত্রিয়রা ক্ষত্রিয়ই থেকে যাবে আর ব্রাহ্মণ, তারা তো জন্ম থেকে ব্রাহ্মণ হয়েই আছে।

জন্মসূত্রে মানুষের যে পরিচয় প্রাপ্তি ঘটে কোন ভাবেই তা ঘুচে যেতে পারে না।

চতুর্থ দৃষ্টি ভঙ্গিঃ

আরও এক নিয়ম বলা হয় এটা যে, বিশ্বে কেবলমাত্র গণতন্ত্রেরই শাসনকার্য পরিচালনার অধিকার আছে, এ জন্য সংখ্যালঘুদের ওপর যেভাবে খুশী জুলুম নির্যাতন চালিয়ে যাও। এই নিয়মের ছত্রচ্ছায়ার এরা বুদ্ধি বিবেচনার তোয়াক্কা না করে সংখ্যালঘুদের ন্যায্য দাবীকে উপেক্ষা করতে থাকে।

পঞ্চম দৃষ্টিভঙ্গিঃ

একই রকমের তাদের আরও একটি নিয়ম হলো যে, ***যা কিছু কুড়িয়ে পাও তা নিয়ে নাও।*** শৈশবে আমরা যখন খেলতে থাকতাম আর পড়ে থাকা কোন কিছু কুড়িয়ে পেতাম তখন আমরা এ কথা বলে তা কুড়িয়ে নিতাম যে, **“কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস খোদার দান, তাকে পায়ে ঠেলো না”** আর আমরা ভাবতাম যে, এমন এক মন্তর এটা, যা পাঠ করে পড়ে থাকা জিনিস কুড়িয়ে নিলেই তা বৈধতা পেয়ে যায়। তবে সে সব জিনিস খেলতে গিয়ে বাচ্চারা যা কুড়িয়ে পায় তা উল্লেখযোগ্য কোন কিছ নয়। কখনও তারা চীনা বাদামের দানা বা ছোলাবীজ, হয়তোবা শার্টের বোতাম অথবা এমনই অন্য কোন কিছু পড়ে থাকতে দেখে তা কুড়িয়ে নেয়। রাসূল করীম (সা.) এর কাছে এক ব্যক্তি একবার জানতে চাইলো যে, হে রাসূলুল্লাহ (সা.)! রাস্তা ঘাটে পড়ে থাকা জিনিসের ব্যাপারে কী নির্দেশ রয়েছে? তিনি (সা.) বললেন, যেমন- ? সে বললো, যেমন জঙ্গলে আমি কোন ছাগল পেলাম তবে আমি কী তা নেবো নাকি নেবো না? তিনি (সা.) বললেন, জঙ্গলে যদি কোন ছাগল তুমি পেয়ে যাও তবে এদিক সেদিক হাঁক ছেড়ে দেখে নাও এ ছাগল কার, আর ডাকা-ডাকি করা সত্তেও এর মালিক যদি তুমি খুঁজে না পাও তাহলে এ ছাগল তুমি নিয়ে নাও আর খেয়েও নাও। কেননা তুমি যদি তা না খাও তবে তোমার ভাই নেকড়ে তা খেয়ে ফেলবে। সে বললো, হে রাসূলুল্লাহ (সা.)! জঙ্গলে যদি উট পাওয়া যায় তাহলে নির্দেশ কী ? তিনি (সা.) বললেন, “উটের ব্যাপারে তোমার কী?

উটের খাবার হলো গাছপালা, আর তার পান করবার পানি হলো তার পেটে-থলের ভেতর। ওই উটের কী হও তুমি! তুমি তাকে মুক্তভাবে বিচরণ করতে দাও"। সে বললো, হে রাসুলুল্লাহ (সা.)! যদি পড়ে থাকা টাকার থলে পেয়ে যাই, তবে? তিনি (সা.) বললেন, থলে পেয়ে গেলে তা উঠিয়ে নাও আর জনগণের মাঝে সে ব্যাপারে বারবার ঘোষণা করতে থাকো। এর মালিককে পেয়ে গেলে তাকে তা দিয়ে দিবে। কাজেই পড়ে থাকা প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে পৃথক পৃথক নির্দেশ রয়েছে। ছাগল বা মুরগী যেহেতু এমন জিনিস যা শিকারী পশু খেয়ে ফেলে, এজন্য এর মালিক পাওয়া না গেলে রাসুল করীম *সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম* এ অনুমতি দান করেছেন যে, একে যে ব্যক্তি পেয়েছে সে নিজে ভোগ করতে তা খেয়ে নিতে পারে কিন্তু অন্য যেগুলোর কথা বলা হলো এর মধ্যে যা আত্মসংরক্ষণে সক্ষম তার ব্যাপারে নির্দেশ হলো ওতে হাত দিও না। আবার যা সংরক্ষিত অবস্থায় থাকতে না পারার আশঙ্কা রয়েছে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন যে, একে উঠিয়ে তো নাও কিন্তু জনগনের মধ্যে নিয়মিত ঘোষণা করতে থাকো আর এভাবে তার প্রকৃত মালিকের অনুসন্ধান করে তার কাছে তা পৌছিয়ে দাও। অতএব, ইসলামে পড়ে থাকা বস্তুর বিষয়ে গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ইউরোপীয় জাতীগুলোর নীতি হলো অভিভাবকত্বহীন দুর্বল জাতিগুলোকে নিজেদের করায়ত্ত করে নাও। এদের ব্যাপারে তারা (ইউরোপীয়রা) বলে, আমরা পড়ে থাকা সম্পদ কুড়িয়ে পেয়েছি। কত বড় দেশ অষ্ট্রেলিয়া। এর ব্যাপারে ইউরোপবাসীরা বলে, আমরা মালিকানাহীন সম্পদ কুড়িয়ে পেলাম। ভারতের শাসন ক্ষমতা নেয়ার বিষয়ে তারা বলে যে, আমরা সহায়হীন অবস্থায় এদের পেয়েছি। দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাপারে বলে থাকে, অভিভাবকত্বহীন অবস্থায় পেয়েছি, উত্তর আমেরিকার ব্যাপারেও তাই বলে। অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতিগুলোর পাঁচটি দৃষ্টি ভঙ্গির সার কথা হলো যেখানেই আধিপত্য বিস্তার করতে পারো তা অধীনস্ত করে নাও। দুর্বল দেশ যেখানকারই হোক না কেন, সেখানে প্রথমে পৌছুবে যারা, সেই দেশ তাদেরই শাসনাধীন হবে।

এ নীতির বাইরে আরও কিছুর জন্য বিশ্বে জুলুম নির্যাতন চলছে, বাস্তব সমস্যাদিও কিছু রয়েছে, যার কারণে এই জুলুম নির্যাতন সংঘটিত হয়েই চলছে।

জনগণ নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হওয়ার কতিপয় বাস্তব প্রেক্ষিত

বাস্তব সমস্যার প্রথমটি হলো অসহায় অভাবগ্রস্তদের সাহায্যার্থে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা কেউ নেই। যদিও এ ক্ষেত্রে কোন কোন দেশে দৃশ্যত সংস্কার হচ্ছে। আর কোন কোন কর্মকর্তা এমন নিয়োজিত রয়েছে যাদের দ্বারা তাৎক্ষনিক ভাবে কিছু প্রতিবিধান করা হয়ে থাকে। এতদসত্তেও ইদানিং তারা যে নব পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে তা এখনও ইসলামের বিধিমালার সমকক্ষ নয়।

দ্বিতীয়ত এমন পথ উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে যাতে কতিপয় ব্যক্তির হাতে সমূদয় সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে।

তৃতীয় এমন রাস্তা খোলা রয়েছে যে, যার হাতেই ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হবে তা আর ফেরত আসবে না।

চতুর্থ অন-উৎপাদনশীল খাতে টাকা খরচ করা হয়। তার নাম রাখা হয় শিল্পকলা। এর মধ্যে কতক ক্ষেত্র যৌক্তিক হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রই নিস্প্রয়োজন।

অকল্যাণের এই সব পথ রূদ্ধ করে দিয়ে ইসলাম উন্নয়নের নব-দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছে। সুতরাং ইসলাম উল্লেখিত সব মন্দেরই সংস্কার সাধন করেছে।

অদৃশ্য দাসত্ব অর্থাৎ পরাধীনতার কারণে সৃষ্ট দু:খ কষ্টের প্রতিবিধান ইসলামে রয়েছে

প্রথমত ইসলাম এ ঘোষণা দেয় যে, খোদা তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা সমগ্র বিশ্বের জন্য কোন একজনের জন্য নয়। এটা এমনই এক নীতিকথা, মাতাপিতা কখনও কখনও মিষ্টির এক থালা যেভাবে তাদের সন্তানদের কোন একজনের হাতে ধরিয়ে দিলে সে একাই তা সাবাড় করতে উদ্যত হয়, আর এ অবস্থায় তার মাতা-পিতা তাকে বলেন, এ মিষ্টি তোমার একার নয়। এতে তোমার সব ভাইবোনদের প্রাপ্য অংশও রয়েছে। অনুরূপভাবে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

হুওয়াল্লাযী খালাক্বা লাকুম মা ফিল আরদে জামিআন (বাক্বারা তৃতীয় রুকূ)

অর্থাৎ এ বিশ্বে যা কিছু আছে তার সব কিছুতেই মানব জাতির অধিকার রয়েছে, মা যেমন তার কোন এক শিশুসন্তানের হাতে মিষ্টির থালা ধরিয়ে দিয়ে বলেন, এই নাও তোমার সব ভাই-বোনদের ভাগ।

এই নীতির অনুসরণে ইসলাম Imperialism (রাজতন্ত্র), Natinal Socialism (জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র) এবং Internatinal Socialism (আন্তর্জাতিকতাবাদী সমাজতন্ত্র), এ সবগুলোকে অকার্যকর করে দেয়। কেননা এই সব দর্শন শক্তিধর ও

কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ এবং সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত জাতিগুলোকে অপর জাতির ওপর আগ্রাসন চালানোর অধিকার দিয়ে থাকে। ইদানিং এ বিতর্কই চলছে যে, একথা যদি মেনে নেয়া হয় যে ভারতের স্বাধীনতা দিয়ে দেয়া যাক তবে তো আগামীকাল আফ্রিকাবাসীরাও নিজেদের সেই স্বাধীনতা দাবী করে বসবে, যেখানে কিনা পূর্বে তারা উলঙ্গাবস্থায় চলাফেরা করতো আর আমরাই তাদের শিষ্টাচার শিখালাম। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই যে, উলঙ্গাবস্থায় তারা চলাফেরা করে থাকলেও তোমরা না হয় তা নাই দেখতে আর নিজেদের বাসগৃহেই বসে রইতে। তোমরা বলে থাকো, ওরা গাছের পাতা খেয়ে থাকতো আর আমরাই তাদের মানবীয় আচার আচরণ শিখিয়েছি তবে এখন কী আমাদের এতটুকু অধিকারও নেই যে আমরা তাদের ওপর কর্তৃত্ব চালাই। আমরা বলি, তারা গাছের পাতা বা ফল ফলাদি খেয়ে দিনাতিপাত করতে থাকলেও তোমাদের এ অধিকার কেমন করে বর্তালো যে তোমরা তাদের দেশ করায়ত্ত করে নিয়ে তাদের **'কেক'** খাওয়াও অতএব

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا

(বাকারা:২৯)

হুওয়াল্লাযী খালাক্বা লাকুম মা ফিল আরদে জামীআন- বলে আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ করে দিয়েছেন, বিশ্বের যেখানেই যা কিছু রয়েছে তাতে গোটা বিশ্বেরই অংশীদারিত্ব আছে। এমন নয় যেমনটা আজকাল দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যে, আমাদের দেশে বাহিরের কোন ব্যক্তি অনুপ্রবেশ করবে না, একই ভাবে আমেরিকাবাসীরাও আইন বানিয়েছে যে, আমাদের দেশে আর কেউ বাইরে থেকে এসে যেন কোন ফায়দা লুটতে না পায়, যদিও কীনা দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের কল্যাণ সমগ্র বিশ্ববাসীরই পাওয়া উচিত। অনুরূপ ভাবে আমেরিকায় প্রাপ্ত মূল্যবান খনিজ সামগ্রী গোটা বিশ্বেরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। এটা হওয়ার কথা নয় যে, কেবল দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকাবাসীরা-ই কেবল এথেকে কল্যাণ লাভ করবে আর অবশিষ্ট পৃথিবী বঞ্চিতই থেকে যাবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ

একই ভাবে ইসলাম সম্পদশালী বিত্তবান ওই লোকদের জুলুমও রুখে দিয়েছে যারা কৌশলগত কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে ধন সম্পদ কুক্ষিগত করে নেয়, তাদের জমাকৃত সেই অর্থ-সম্পদে ইসলাম বাকী দুনিয়ার অংশীদারিত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে। কৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ না করলে তারা এতটা বিত্তশালী হতে পারতো না। অথচ তারা এখন অর্থের জোরে প্রাকৃতিক সম্পদ খনিজ সম্পদ, পানি সম্পদ, গ্যাস ও জ্বালানী সম্পদ সবই নিজেদের করায়ত্ত করে নিচ্ছে আর এভাবে তারা অন্যের অধিকার হরনের কারণে পরিণত হচ্ছে। ইসলাম এর প্রতিবিধানে এ নীতি নির্ধারণ করেছে যে খনির মালিক যে পরিমাণ খনিজ সম্পদই উত্তোলন করুক, আহরিত সেই প্রাকৃতিক সম্পদের এক পঞ্চমাংশের অংশীদারিত্ব রাষ্ট্রের।

আবার খনির মালিক তার খনিজ সম্পদ বাজার জাত করার পর উদ্বৃত্ত যে পরিমাণ খনিজ সম্পদ বছর জুড়ে তার কাছে মজুদ হিসাবে থেকে যায় তার যাকাতও আদায় করতে হয় আর এভাবে রাষ্ট্র খনিজ সম্পদের মালিকানাস্বত্ত্বের অংশীদার হয়ে যায়। এতে গরীবদের জন্য যথেষ্ট অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা পড়ে, যা থেকে গরীবদের হক্ব পুরণ করা যায়। এতে করে তেমন বিপদের উদ্ভব হয় না যা খনি খননের ফলে তথায় বসবাসকারীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ঘটে থাকে। (চলবে)

ভাষান্তর : **মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্**

(কুরআনের ব্যাখ্যার অবশিষ্টাংশ)
২য় পৃষ্ঠার ধারাবাহিকতায়

আতিথেয়তার শিষ্টাচারে কোন ত্রুটি রয়েছে। অতিথিগণ সম্ভবত: ইব্রাহীম (আ.)-এর মুখমন্ডলের অস্থিরতা লক্ষ্য করে তাঁর মনের বিচলিত অবস্থাকে উপলব্ধি করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে উৎকণ্ঠা মুক্ত করবার জন্য তাঁরা বললেন, তাঁরা মোটেই অসন্তুষ্ট হননি এবং যে কারণে তাঁরা খাদ্যে অংশ গ্রহণ করেন নি তা হল– যে উদ্দেশ্যে তাঁরা নিয়োজিত তা এক অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ বিষয় যা তাঁদের আহারে অরুচি এনে দিয়েছে। অতিথিদের এই জবাবেও দেখা যায় যে, তারা ফিরিশ্তা ছিলেন না, নতুবা তাঁরা এটাই বলতেন যে, তাঁরা মানব নয় বলে যমীনের খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন না।

হযরত লূত (আ.) 'ফিলিস্তিন মোআব' এবং 'আম্মন'-এর অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ ছিলেন। তিনি হারানের পুত্র, তেরাহ্‌র পৌত্র ছিলেন এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সঙ্গে কেনানে মিলিত হয়েছিলেন।

১৩৩৩। এই আয়াতে 'গৃহের অধিবাসী' বলতে এখানে নিশ্চিতভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর স্ত্রীকে বুঝিয়েছে, কেননা তখন পর্যন্তও তাঁর কোন সন্তান হয়নি। প্রকৃতপক্ষে নবীদের সম্পর্কে কুরআনে ব্যবহৃত **'আহ্‌লাল্ বায়ত'** সাধারণত: নবীর স্ত্রী বা স্ত্রীদেরকে বুঝিয়েছে (১৮:১৩; ৩৩:৩৪)।

মমতাময় যে পরশ বেদনার অশ্রু মুছে দেয়

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে ইসলামের ছাঁচে আল্লাহ্ তাআলা ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের এক অনুপম পদ্ধতি কায়েম করেছেন। মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্বের বন্ধন সৃষ্টি করাই হচ্ছে এ ধর্মের সনাক্তকারী বৈশিষ্ট। পবিত্র কুরআনের ভাষায় "*তোমরাই হচ্ছো সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য উত্থিত করা হয়েছে*" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১১)।

আজীবন নিজ সর্বোচ্চ মানবীয় গুণ ও পুণ্য প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে মহানবী (সা.) এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, মানুষের উচিত, আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সমপরিমাণে দয়া প্রসারিত করা।

সারা জীবন তিনি (সা.) সকলের প্রতি দয়ার্দ্র ছিলেন, মুসলমান বা অবিশ্বাসী, দরিদ্র অথবা অনাথ, যে-ই হোক না কেন তাঁর (সা.) করুণা সমগ্র সৃষ্টিকে বেষ্টন করে রেখেছিল। মানবজাতি ও বিশ্বের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁর (সা.) বাঁধ-ভাঙ্গা সেবা ছিল অতুলনীয় এবং এরকম উদাহরণ শুধুমাত্র মুসলিম উম্মাহর মধ্যেই দেখা যেতো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), যাঁর জীবন ছিল মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ প্রতিফলন। বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর (সা.) পদাংক অনুসরণের মাধ্যমে তিনি (আ.) আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবা করাকে জীবনের প্রধান লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি (আ.) তাঁর জামা'তকে নির্দেশ দিয়েছিলেন,–"আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সৃষ্টির সেবায় নিজেকে পূর্ণভাবে নিয়োজিত কর। খোদাপ্রদত্ত তোমার শক্তি এবং যে মহিমা আল্লাহ্ তোমাকে দান করেছেন, তদ্দারা মানবতার সেবা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর"।

তিনি (আ.) আরো বলেন, "আমার মতে, ভালবাসা এবং অন্যের আবেগ অনুভূতির সাথে একাত্ম হবার ক্ষমতার কোন সীমারেখা নেই। যুগের প্রচলিত অজ্ঞতার বিপরীতে আমি তোমাদের দয়া ও ভালবাসাকে কেবল মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে উপদেশ দেইনা–অবশ্যই না। তারা হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, অথবা অন্য কেউ হোক, আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টির প্রতি বদান্যতার হাত প্রসারিত কর। আমি এটা পছন্দ করি না যখন মানুষ নিজ জাতি ও গোত্রের কয়েদীদের প্রতি দয়া করতে লোকদেরকে বাধা দেয়। এদের মধ্যে আবার অনেকে এমনও রয়েছে যারা এতদূর পর্যন্ত বলে যে, অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব অসাধু ব্যবহার এবং অন্যায় আচরণ করা অনুমোদনীয়"।

সৃষ্টির প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মহান সেবার উদাহরণে নিম্নবর্ণিত ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে :–

"একবার কিছু সংখ্যক গ্রাম্য মহিলা তাদের বাচ্চাদেরকে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে দেখা করাতে আনলেন। অল্পক্ষণ পর তাঁর বাড়ীর ভিতর থেকে কয়েকজন মহিলা বের হয়ে এলেন এবং তাদেরকে কিছু খাবার ও পানীয় পেশ করলেন। এ সময় মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি খুবই জরুরী ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখায় ব্যস্ত ছিলেন। যাহোক, পরে যখন ঘটনাক্রমে আমি তাঁর বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ আমি তাক লাগানো এক দৃশ্য অবলোকন করলাম এবং তাঁর মধুময় সম্ভাষণ লাভ করলাম। আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সিধা ও অটল অবস্থায় দন্ডায়মান দেখলাম, ঠিক যেভাবে ইউরোপীয়ানরা দাপ্তরিক কাজ পরিচালনাকালে করে থাকে, তাঁকে ঘিরে ৫ অথবা ৬ টি খোলা বাক্স ছিল যেগুলি থেকে তিনি বিভিন্ন ধরনের ঔষধ ও প্রতিষেধক বের করে ছোট ছোট বোতলে ঢেলে তাদেরকে দিচ্ছিলেন, যারা তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিল। এ কাজ প্রায় তিন ঘন্টা ধরে চললো। পরে আমি তাঁকে বললাম যে, যদিও তাঁর এ কাজটি ছিল বাস্তবিকপক্ষে মমতাময় ও করুণায় পূর্ণ, তথাপি তাঁর অনেক অমূল্য সময় নষ্ট করে দিয়েছে এরা। তিনি আমার এ কথার জবাব যত স্বাচ্ছন্দ্যে দিলেন এবং সে সময় তিনি যে মানসিক স্বস্তি ও তৃপ্তি প্রদর্শন করলেন, সেটা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলো। তিনি (আ.) বললেন, "এ কাজগুলি হলো ধর্মের অংশ"। যেসব লোক তাঁর কাছে এসেছিল তারা গরীব এবং কয়েক মাইলের মধ্যে কোন হাসপাতাল ছিল না। অতএব, তিনি আমাকে বললেন যে, যাদের প্রয়োজন পড়তে পারে তাদেরকে সরবরাহের জন্য তিনি সর্বদা ইউরোপীয় ঔষধ প্রস্তুত রাখতেন। এ ধরনের ন্যায়পরায়ণ কাজ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মহিমান্বিত।" [বর্ণনায় –জনাব মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রা.)]

করুণার যে বীজ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) কর্তৃক রোপিত হয়েছে তা বৃদ্ধি পেয়ে এবং তাঁর খলীফাগণের মাধ্যমে পুষ্পিত হতে থাকবে। মহানবী (সা.) এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর শিক্ষাসমূহ আহমদীয়াতের খলীফাগণ কর্তৃক বিস্তার লাভ করতে থাকবে। এই খিলাফত কখনো **নূর উদ্দিন (রা.)** এর সমর্থন লাভ করে আহতদের ক্ষতের যত্ন নিয়েছে, **বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)** এর মাধ্যমে দুর্বল এবং বাকরুদ্ধদেরকে কণ্ঠস্বর দান করেছে, **নাসের** আকারে ভালবাসার বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে ঘৃণার মূলোৎপাটন করেছে এবং **তাহের** রূপে

আবির্ভূত হয়ে অসুস্থদের আরোগ্যদান এবং গৃহহীনদের গৃহের সংস্থান করেছে, আর **মাসরূর** হিসেবে ঐসব লোকদের সমর্থন দিচ্ছে যারা বড় ব্যথা ও নিদারুন যন্ত্রণা ভোগ করছে।

সর্বত্র প্রত্যেক দুর্ঘটনা, দুর্যোগ এবং বিপদের সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর খলীফাগণ মানবতার সাহায্যকারী হিসেবে অগ্রগামী হয়ে রয়েছেন। তাঁর (আ.) মহান খলীফাগণ আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবায় অনেক বড় অবদান রেখেছেন এবং অসংখ্য উপদেশ প্রদান করেছেন, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

চিকিৎসা প্রচেষ্টা সমূহ :

পূর্বে উল্লেখিত ঘটনা অপরের মঙ্গল ও হিতসাধনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অনুভূতির গভীরতা এবং শক্তির এক সামান্যতম আভাস দান করে মাত্র। একই ভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) যিনি উপমহাদেশের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যিনি মসীহ মাওউদ (আ.) এর আদর্শ অনুসরণ করে চলতেন, সর্বদা অনাথ ও অভাবীদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে রাখতেন। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি প্রায়ই বিনামূল্যে রোগীদের চিকিৎসা করতেন। এভাবে কাদিয়ান শহর একটি জনকল্যাণকামী কর্মকান্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ ঐতিহ্য বছরের পর বছর জারী থাকে এবং হাজার হাজার লোকের স্বাস্থ্যসেবা ও হিতসাধনে আর আর্ত পীড়িতদের দেখাশোনায় সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান সেখানে এবং পরবর্তীতে রাবওয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে :

‘নূর হাসপাতাল’ কাদিয়ান :

২১ জুলাই, ১৯১৭ সনে, দ্বিতীয় খিলাফতের সময় কাদিয়ানে ‘নূর হাসপাতাল’ এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এ হাসপাতালটি সুদীর্ঘ ৯০ বছর যাবত ধর্ম, গোত্র ও নির্বিশেষে সকল জীবন মানের রোগীদের জন্য বৈষম্যহীনভাবে চিকিৎসা সেবা ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে। ১৯৯৮ সনের ৯ই নভেম্বর তারিখে এই হাসপাতালের নতুন ইমারতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়, যেটা ২০০৫ সনে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) উদ্বোধন করেন।

‘ফযলে ওমর’ হাসপাতাল, রাবওয়া :

ফযলে ওমর হাসপাতালের ভিত্তির সন্ধান করতে হলে পাকিস্তান সৃষ্টির সময়ের দিকে পিছন ফিরে তাকাতে হবে, যখন ১৯৪৯ সনের ১২ই এপ্রিল অস্থায়ীভাবে একটি তাঁবুতে এর যাত্রা শুরু হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এই হাসপাতালের ইমারতের ভিত্তি প্রস্তর ১৯৫৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারী আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম স্থাপন করেন। ২০০১ সনে এর **“যুবাইদাবানী”** শাখা নির্মাণ করা হয় যেখানে মাতৃসদন ওয়ার্ড ও একটি বিশাল শিশুরোগ বিভাগ চালু করা হয়। হাসপাতালটি বিত্ত, লিঙ্গ, ধর্ম অথবা জাতিগত কোন প্রভেদ রেখা না টেনে যাদেরই চিকিৎসা-সহযোগিতার প্রয়োজন, তাদের সকলেরই যত্ন নিয়ে থাকে। ‘ফযলে ওমর’ কেবল একটি হাসপাতালই নয়, তদোপেক্ষা অনেক বড় একটি প্রতিষ্ঠান, এটা রাবওয়া ও এর চার পাশের এলাকার বাসিন্দাদের জন্য একতা ও শান্তির প্রতীকি এক কেন্দ্র।

তাহির হার্ট ইন্সটিটিউট :

পঞ্চম খিলাফতের যুগে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর পক্ষে নাযের-ই-আ'লা সাহেবযাদা মির্যা খুরশীদ আহমদ কর্তৃক হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর স্মৃতিস্বরূপ মানবসেবা মূলক সৌন্দর্যের এক মূর্তপ্রতীক **“তাহির হার্ট ইন্সটিটিউট”** এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এই হাসপাতালে ওপেন হার্ট সার্জারী, এনজিওগ্রাফি এবং এনজিও প্লাষ্টি ও হৃৎপিন্ডের অন্যান্য বহুবিধ চিকিৎসা-সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে।

নূরুল ‘আইন দায়রাতুল খিদ্‌মাতিল ইনসানিয়া :

পাকিস্তান মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার আওতাধীনে রাবওয়ায় ফযলে ওমর হাসপাতালের বিপরীত দিকে একটি আধুনিক ৩ তলা ভবনে রক্ত ও চক্ষু ব্যাঙ্ক নির্মাণ করা হয়েছে। যেসব লোক কর্নিয়ার (যে ঝিল্লি চোখের মনি ও চোখের তারার রঙিন অংশ আচ্ছাদন করে রাখে) সমস্যায় আক্রান্ত, তাদের দৃষ্টি শক্তির উন্নতি-বিধানের উপায় নির্ণয়ের লক্ষ্যে ২০০০ সনের নভেম্বর মাসে ‘নূর আই ডনার্স এসোসিয়েশন’ Noor Eye Donors’ Association প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সংস্থার মাধ্যমে জামা'তের সদস্যগণ অন্যদের চোখের চিকিৎসা করতে এবং অনেক লোকের দৃষ্টি পুনরুদ্ধারে সাহায্য করতে তাদেরকে চক্ষু দান করতে সমর্থ হয়েছে। পাকিস্তানে বর্তমানে এর ২৬ টি শাখা চালু আছে।

তাহির হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্র :

হোমিওপ্যাথিক হচ্ছে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু রোগসমূহের কার্যকর চিকিৎসার সহজ পন্থা। ১৯৯৯ সনে পাকিস্তান মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া একটি হোমিওপ্যাথি ক্লিনিক ও দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করে। যাহোক, চাহিদার ব্যাপকতায় এটাকে আরো অধিক সক্রিয় করার প্রয়োজন হয়। সে অনুযায়ী ২০০৫ সনের ১৭ এপ্রিল তারিখে ‘তাহির হোমিওপ্যাথিক

হাসপাতাল ও রিসার্চ সেন্টার' এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই হাসপাতালের মাধ্যমে প্রতিদিন আনুমানিক ৫০০ রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

'নূসরাত জাঁহা এ্যাডভান্স ফরোয়ার্ড স্কীম :

১৯৭০ সনে খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর পশ্চিম আফ্রিকা সফরের পর 'নূসরাত জাঁহা' স্কীম প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাহ্‌রীকে জাদীদ এর আনুকূল্যে এই কর্মপরিকল্পনা আফ্রিকায় সামাজিক ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়। হাসপাতাল খোলার পাশাপাশি শিক্ষার ক্ষেত্রেও জামা'ত তাদের দাতব্য সেবা কর্ম প্রসারিত করার সুযোগ লাভ করেছে।

এই স্কীমের অধীনে ঘানার কোকোফুতে প্রথম আহমদীয়া হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। ১৯৭১ সনে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার গোলাম আহমদ সাহেব সেখানে প্রথম ডাক্তার হিসেবে সেবা করার সম্মান লাভ করেন। পরবর্তী বছরগুলোতে আরো ১২টি হাসপাতাল উদ্বোধন করা হয়। আজ পর্যন্ত জামা'ত কর্তৃক ৫৪ টি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। অঞ্চল বিশেষে গৃহযুদ্ধের কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের কতকগুলো বন্ধ করতে হয়েছে।

তবুও পশ্চিম আফ্রিকায় সাফল্য লাভের পর মহাদেশটির কেন্দ্রীয় ও পূর্বাঞ্চলে জামা'তের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এ স্কীমের অধীনে ১২ টি দেশে ৪১ টি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় ৫০ জন ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যাদের মধ্যে ২০ জনেরও অধিক ডাক্তার মানবতার সেবায় তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এসব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এলোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রদান করে থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) মজলিস নুসরাত জাঁহা-এর মাধ্যমে এ অঞ্চলে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা ও ঔষধালয় চালু করেছেন।

১৯৯১ সন থেকে ঘানায় অনেকগুলি হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক খোলা হয়েছে। ১৯৯৫ সনে একটি **'হোমিও কমপ্লেক্স'** স্থাপন করা হয় যা দেশটিতে বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক ঔষধপত্র ও উপকরণাদি প্রস্তুত করে থাকে।

২০০৭ সনে পঞ্চম খিলাফতকালে এই স্কীম দ্বারা আরো উন্নতি সাধিত হয়েছে। একজন ভারতীয় ডাক্তারের মাধ্যমে ঘানায় সে বছর একটি ভেষজ ঔষধের চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়।

নূসরাত জাঁহা স্কীম চালু হবার পর এর অধীনে এ যাবত ২৫০ জনেরও অধিক ডাক্তার সেবা প্রদান করেছেন।

সামাজিক ও বিবিধ-সেবা সমূহ :

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)এর খলীফাগণ কর্তৃক মানবতার সেবায় যেসব বর্ধিত প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে তা উল্লেখিত হচ্ছে–

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর রীতি ও শিক্ষা মান্য করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) গরীব ও এতিমদের মঙ্গলের জন্য **'দারুয-যিয়াফত'** স্থাপন করেন। জামা'ত অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাদের সম্পদ, সময় ও প্রচেষ্টা দ্বারা এ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে চলছে।

১৯২৭ সনে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দারিদ্র পীড়িত অসহায় মহিলা ও শিশুদের জন্য একটি স্কীম চালু করেন। একই বছর একটি অনাথাশ্রম স্থাপন এবং গরীবদের সাহায্যার্থে **'দারুশ্ শুয়ুখ'** নির্মাণ করা হয়।

১৯৩৪ সনের জানুয়ারী মাসে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ঘোষণা দেন যে, ভারতে ভূমিকম্পের শিকারে পরিণতদের জন্য সাহায্য-প্রচেষ্টা আমাদের জামা'তের জন্য একটি সুযোগ, যাতে আমরা এটা প্রমাণ করতে পারি যে, আমাদের জামা'ত সবার চাইতে বেশি মানব-দরদী।

১৯৪১ সনের শুরুতে ভারত দুর্ভিক্ষ কবলিত হবার কারণে গম ও শস্যের ঘাট্‌তি হয়। দুর্ভিক্ষে আক্রান্তদের সাহায্যের জন্য অর্থ ও খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে জামা'ত হুযূর (রা.) কর্তৃক আদিষ্ট হয়।

১৯৪২ সনের ১১ সেপ্টেম্বর গরীবদের আবাসনের জন্য হুযূর (রা.) গৃহনির্মাণের একটি স্কীম চালু করেন।

১৯৪৪ সনের ৩০ মে তারিখে হুযূর (রা.) সমগ্র জামা'তকে, বিশেষ করে কাদিয়ানের আহমদীদেরকে বুভুক্ষদের খাওয়ানোর নির্দেশ দেন।

দেশ বিভাজনের সময় হুযূর (রা.)-এর নির্দেশ মোতাবেক হিজরতকারীদেরকে কম্বল ও কাঁথা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সনের মধ্যবর্তীতে উপমহাদেশ যখন বন্যা কবলিত হয় তখন হুযূর বন্যা-দূর্গত এলাকাসমূহ পরিদর্শন করেন এবং দুর্গতদেরকে সহযোগিতা করার জন্য জামা'তকে নির্দেশ দেন।

১৯৬৫ সনের ১৭ সেপ্টেম্বর অনাথ ও গরীবদেরকে খাদ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "আমি জামা'তের সকল ওহ্‌দাদারকে এ বিষয় অবহিত করতে চাই যে, কোন আহমদী যাতে ক্ষুধার্ত না থাকে সে বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকা তাদের দায়িত্ব" (আল ফযল, ১০/০৩/১৯৬৬)।

১৯৭৩ সনে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বন্যা কবলিতদের সাহায্যের জন্য 'বাইতুল মাল' থেকে অর্থ প্রদান করা হয়।

১৯৭৭ সনে রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তান আক্রান্ত হবার পর আফগান

উদ্বাস্তুদেরকে সাহায্যের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর নির্দেশ মোতাবেক অর্থ সংগ্রহ করা হয়। উপরন্তু ১৯৮১ সনে হুযূর সুনির্দিষ্ট ভাবে যুদ্ধের কারণে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য দোয়া করতে জামা'তকে নির্দেশ দান করেন।

মানবতার সেবার ক্ষেত্রে গৃহীত উদ্যোগ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর ইংল্যান্ডে হিযরতের পর শ্লথ হয়নি বরং জামা'তের অসহায় অবস্থা এবং চরম বিরোধিতা মোকাবিলা করা সত্ত্বেও আগের মতই একই রকম উৎসাহ ও তেজোদীপ্ত হয়ে জামা'ত এ উদ্যোগ চালু রেখেছে। ১৯৮৩ সনের ১১ নভেম্বর তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) নি:স্বদের গৃহায়ণের জন্য **'বুয়ূতুল হামদ কলোনী'** কর্মপরিকল্পনা চালু করেন। এ প্রকল্পের জন্য জামা'তকে এক কোটি রূপীর সংস্থান করতে নির্দেশ দেয়া হয়।

সোমালিয়া ও **রোয়ান্ডার** মত দেশসহ আফ্রিকার দুর্ভিক্ষকবলিত এলাকা সমূহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে ৯ নভেম্বর, ১৯৮৪ সনে হুযূর জামা'তকে নির্দেশ দেন। ১৯৮৬ সনের ১৪ মার্চ তারিখে বিশ্বব্যাপী নির্দোষ কারাবন্দী ও তাদের পরিবার এবং শহীদ আহমদী পরিবারের মঙ্গলের জন্য হুযূর **'সৈয়দনা বিলাল ফান্ড'** চালু করেন। ২৮ মার্চ ১৯৮৬ তারিখে হুযূর **'তৌছিয়ে মাকান ভারত ফান্ড'** চালু করেন।

১২ই আগষ্ট, ১৯৮৯ তারিখে ভারত ও আফ্রিকার গরীব ও নি:স্বদের উন্নতির জন্য হুযূর জামা'তকে পাঁচ কোটি রুপী সংগ্রহের নির্দেশ দান করেন।

এতিমদের আবাসন ও সাহায্য দানের জন্য রাবওয়ায় **'দারুল করম'** ইমারত নির্মিত হয়। ১৯৯১ সনে, এর শুরু থেকেই এ তহবিলটি দ্বারা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এক হাজারেরও অধিক অনাথের দেখাশুনা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে।

৩০ অক্টোবর, ১৯৯২ তারিখে হুযূর (রাহে.) বলেন যে, জামা'তের উচিত, বসনিয়ার শিশু, যারা যুদ্ধের কারণে অনাথ হয়েছে এবং সোমালিয়াতে যারা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে, তাদের জন্য উপহার সামগ্রী এবং খাদ্য সংগ্রহ করা।

২০০৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে গরীব মেয়েদের বিবাহে সহযোগিতা দানের উদ্দেশ্যে হুযূর **'মরিয়ম শাদী ফান্ড'** চালু করেন।

চতুর্থ খিলাফতের সময়ে স্থাপিত একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হচ্ছে **'হিউম্যানিটি ফার্ষ্ট' (Humanity First)** দাতব্য প্রকল্প। এ প্রকল্প শুরু থেকেই বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে আফ্রিকার যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার শিকার সাধারণ মানুষকে সাহায্য, সহায়তা ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ২৬ টি দেশে দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে সেবামূলক সংস্থা হিসেবে জাতিসংঘে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

২০০৩ সনে চতুর্থ খিলাফতের যুগ শেষ হয়। পঞ্চম খিলাফতের উদ্ভব জামা'তের জন্য এক নতুন ভোরের ঘোষণা করে এবং আহমদীয়া জামা'তের লোকহিতৈষী ও দাতব্য কর্মকান্ডের ঐতিহ্যের স্থায়ীত্বেরই সংকেত বহন করে। এভাবে ভবিষ্যতে যত প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাই বিশ্বকে কষ্ট দিক, হতে পারে তা এশিয়ার সুনামী, ইউরোপের ভূমিকম্প, আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ অথবা ক্ষরা ইউরোপ অথবা আমেরিকার বন্যা ও ঘূর্ণাবাত্যা। জামা'ত সর্বদা খলীফার ডাকে সাড়া দেবে এবং একই সেবার হাত প্রসারিত করবে দূর্গতদের প্রতি- প্রয়োজন যাদের সর্বাধিক।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) দয়া ও মমতা পোষণ করতেন। আল্লাহর রহমতে তাঁর খলীফাগণের মাধ্যমে অদ্যাবধি তা চালু আছে। তাঁর রোপিত দয়ার বীজ খলীফাগণের যত্ন ও মনযোগে বড় হয়েছে এবং মুকুলিত হয়ে করুণা ও ভালবাসার বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্ এ জামা'তকে খলীফার সাহায্য ও নেতৃত্বে মানবতার সেবা জারী রাখার সামর্থ্য দান করুন, আমীন!

শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্পসমূহ :

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক স্থাপিত জ্ঞান ও শিক্ষার ভিত্তি এতই বিশাল ছিল যে ঐগুলি এমনকি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারাও প্রশংসিত হয়েছে এত বেশী প্রশংসিত হয়েছে যে তাদের মধ্যে একজন, যে তাঁর ভুল ধরতে তাঁর বক্তব্যকে অতিশয়োক্তি বলে চিহ্নিত করতে চাইতো, সেই ব্যক্তিও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, আগাগোড়া ইসলামের ইতিহাসে ইসলামী শিক্ষা ও ধর্মতত্ত্বের বিষয়ে তাঁর মত আর কেউ এত বেশি অবদান রাখেনি। উপরন্তু এই মহানুভব সত্তা সকলকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর লিখনী এতই ব্যাপক এবং প্রভাবশালী ছিল যে, জ্ঞান ও চিন্তার জগতে ঐগুলি একটি আন্দোলন সৃষ্টি করতো। জীবদ্দশায় তিনি (আ.) তাঁর অনুসারীদের চিন্তা-চেতনা ও বোধশক্তির উন্নতি বিধানে বিশেষ যত্ন ও মনযোগ দিয়েছিলেন। এর ফলে, তিনি সর্বদা তাদেরকে যতদূর সম্ভব উচ্চশিক্ষিত হতে এবং সম্ভাব্য পরিমাণ বেশি জ্ঞান আহরণ করতে উপদেশ দিতেন। তাঁর জীবিতাবস্থায় এবং তারপরেও তাঁর বহু সংখ্যক সাহাবী ও জামা'তের সদস্যদের শিক্ষাগত, মেধাগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক মানের উন্নতি বিধানে এত বেশি শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যে, তাদের এ প্রচেষ্টাকে কেবলমাত্র অপরিমেয় ও অনুপম হিসেবেই বর্ণনা করা যায়।

মাদ্রাসা তা'লিমুল ইসলাম, তা'লিমুল ইসলাম হাইস্কুল ও তা'লিমুল ইসলাম কলেজ প্রতিষ্ঠা :

জামা'তের সদস্যদেরকে ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য তাদেরকে ও তাদের বংশধরদেরকে খৃষ্টীয় নাস্তিকতা ও পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের প্রভাব থেকে রক্ষা করা এবং ইসলামের খোদাভীরু সেবক বানানোর জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ১৮৯৮ সনে মাদ্রাসা তা'লিমুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসাটি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইহা মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত হয়। ১৯০০ সনের মধ্যে ইহা হাইস্কুল এবং ১৯০৩ সনে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কলেজ হিসেবে কাজ শুরু করে। কলেজ বিল্ডিংটি 'তা'লিমুল ইসলাম কলেজ' নামে অভিহিত হয়। ভারত বিভাজনের পর 'তা'লিমুল ইসলাম হাইস্কুল'টি 'সিং বাজোয়া খালসা হাইস্কুল' এবং কলেজটি 'শিখ ন্যাশনাল কলেজ' নামে পরিবর্তিত হয়।

পাকিস্তানে হিজরতের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জামা'তের শিক্ষার বিষয়টির দেখাশুনা চালিয়ে যাবার প্রয়োজন অনুভব করেন এবং এ উদ্দেশ্যে লাহোরের এক আস্তাবলকে রূপান্তরিত করে তিনি 'তা'লিমুল ইসলাম কলেজ' স্থাপন করেন। পরবর্তীতে এই ইমারতটি DAV কলেজের আবাসন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। রাবওয়া শহর সৃষ্টির পর ১৯৫৪ সনে কলেজটি সেখানে পুন:স্থাপন করা হয়। একইভাবে চিনিউটে শিশুদের জন্য 'তা'লিমুল ইসলাম হাইস্কুল' স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ইহা রাবওয়ায় স্থানান্তর করা হয়। **'নুসরাত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়' ও 'জামেয়া নুসরাত কলেজ'** সহ অনেক বালিকা বিদ্যালয়ও রাবওয়াতে স্থাপন করা হয়। অধিকন্তু ১৯৫৪ এবং ১৯৭২ সনের মধ্যে বহু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। রাবওয়ার এসব স্কুল ও কলেজ তাদের ছাত্রদেরকে উচ্চমানের শিক্ষা প্রদান করেছে। যাহোক, ১৯৭২ সনে সরকার কর্তৃক এসব প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয় এবং দ্রুত এদের মান হ্রাস পায়। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠান ভগ্নদশাগ্রস্ত এবং জীর্ণাবস্থায় নিপতিত হয়েছে এবং এদের শিক্ষাদানের মানও অনেক হ্রাস পেয়েছে। তবে আহমদীয়া খিলাফতের পৃষ্ঠপোষকতায় জামা'ত আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী ও স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

জামা'তের জামেয়া প্রতিষ্ঠা :

১৯০৫ সাল ছিল জামা'তের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বহ বছর। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দুইজন বিশিষ্ট ও বিদ্যান সাহাবী মৌলভী আব্দুল করিম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.) এবং হযরত মৌলানা বুরহানুদ্দীন ঝিলামী সাহেব (রা.) এ বছর ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তের আলেম ও ধর্মপ্রচারক প্রস্তুত করার জন্য জামা'তকে নির্দেশ দান করেন। এভাবে ১৯০৬ সনে মাদ্রাসা তা'লিমুল ইসলামে ধর্মীয়তত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯০৯ সনের মার্চ মাসে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মাদ্রাসা থেকে এই বিভাগকে পৃথক করেন এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর স্মরণে **'মাদ্রাসা আহমদীয়া'** নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান দাঁড় করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর খিলাফতকালে এ প্রতিষ্ঠানটিকে আরবী কলেজে পরিণত করে এর নাম দেয়া হয় 'জামেয়া আহমদীয়া' দেশ বিভাজনের পর লাহোর চিনিউট এবং আহমদনগর সহ বিভিন্ন স্থানে এর কর্মকান্ড প্রসারিত করা হয়। রাবওয়া জনবসতির রূপ লাভ করার পর সেখানে জামেয়া আহমদীয়া একটি স্থায়ী নিবাস খুঁজে পায়। (তাহরীকে জাদীদ, ৩য় খন্ড থেকে)।

এই প্রতিষ্ঠান, যার ভিত্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্থাপন করেছিলেন, এখন একশত বছরের অধিক সময় ধরে চলছে। আজ ১৩ টি দেশে এর শাখা রয়েছে এবং এর শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর সময় ইন্দোনেশিয়া, ঘানা এবং নাইজেরিয়াতে জামেয়াসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। চির প্রসারমান জামা'তের প্রয়োজনীয়তা এবং দাবীর সাথে তাল মেলাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তানজানিয়া, কেনিয়া, বাংলাদেশ এবং কানাডায় জামেয়া স্থাপনের কাজ দেখাশুনা করেন। বর্তমান খিলাফতের সময়ে মালয়েশীয়া, যুক্তরাজ্য, সিয়েরালিওন এবং শ্রীলঙ্কায় জামেয়াসমূহ খোলা হয়েছে এবং ঘানায় একটি আন্তর্জাতিক জামেয়া খোলার পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে। ২০০৮ সনে জার্মানীতেও একটি জামেয়া খোলার প্রত্যাশা রয়েছে।

শুধুমাত্র ধর্মীয় লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই জামা'তের শিক্ষার উদ্যোগসমূহ সীমিত নেই। জামা'ত ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপনের প্রচেষ্টায় রত, যেগুলি কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়। নেযারত তা'লীম, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, পাকিস্তান এর পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তানে ১৭ টি স্কুল জামা'ত কর্তৃক চালু আছে যেগুলিতে দেশটির জাতীয় পাঠ্যক্রম মোতাবেক শিক্ষাদান করা হয়। নুসরাত জাঁহা স্কীমের আওতায় তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমান আহমদীয়া, পাকিস্তান কর্তৃক যেসব মাধ্যমিক স্কুল খোলা হয়েছে তাদের সংখ্যা ও দেশের নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :

* ঘানা ৭টি স্কুল, নাইজেরিয়া ৪টি স্কুল, সিয়েরালিওন ৪১ টি স্কুল, লাইবেরিয়া ১ টি স্কুল, গাম্বিয়া ৪ টি স্কুল, উগান্ডা ১ টি স্কুল।

এগুলির অতিরিক্ত আরো বহুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ও এই স্কীমের অধীনে জামা'ত কর্তৃক চালু রয়েছে।

(তাহরীকে জাদীদের খিলাফত শতবার্ষিকী স্মরণিকা অবলম্বনে)

যুগ-খলীফার দিক-দিশারী বাণী

ন্যায়সঙ্গত আদেশের স্বরূপ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে খুতবা জুমুআয় বলেন, অনেক সময় কিছু লোক "*ন্যায় সঙ্গত সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রতিপালন*"–আনুগত্যের এই চক্রে পড়ে জামা'তী নিযাম থেকে দূরে সরে যায়। অন্যান্য লোকদেরকেও বিপথগামী করতে তারা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তারা সমাজের মাঝে অনিষ্ট এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এ বিষয়টি স্পষ্ট করবার জন্য যে কথা বলতে যাচ্ছি তা হল, নিজে নিজেই ন্যায় বা অন্যায় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোন রকম ব্যাখ্যা করবেন না। অন্যায় আদেশ তো সেটিই যা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তাআলার আদেশ নিষেধের পরিপন্থী এবং শরিয়তের হুকুম-আহকামের সুস্পট লংঘন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নের এই হাদীস থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল করীম (সা.) কোন এক অভিযানের জন্য একদল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং এক ব্যক্তিকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন–যেন তারা সকলে সর্বাবস্থায় তার কথা শুনে এবং তাঁর আনুগত্য করে। একদিন সেই ব্যক্তি আগুন জ্বালিয়ে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা সকলে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়।' কিছু লোক তাঁর কথা শুনলো না। তারা বলতে লাগলো, 'আমরা তো আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই মুসলমান হয়েছি।' কিন্তু কিছু লোক আগুনে ঝাঁপ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। আঁ হযরত (সা.) যখন এই ঘটনা শুনতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, 'যদি এই লোকেরা সত্যিই আগুনে লাফ দিত তাহলে তারা চিরকাল আগুনেই থাকতো। অত:পর তিনি আরো বললেন, আল্লাহ্ তাআলার বিদ্রোহী ও অবাধ্য হওয়ার মতো অবস্থায় কোন আনুগত্য আবশ্যিক নয়। আনুগত্য কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গত আদেশের জন্যই অপরিহার্য। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ)

তাহলে একদিকে এ হাদীস থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট, আদেশ অমান্য করার সিদ্ধান্তটি কোন একজনের ছিল না। কিছু লোক তো আগুনে লাফিয়ে পড়ার জন্য উদগ্রীব ছিল। কেননা তারা মনে করেছিল সর্বাবস্থায় আমীরের আনুগত্য আবশ্যক। তারা ভেবেছিল ইসলামে আনুগত্যের শিক্ষা এরূপ যে, প্রত্যেক মুহূর্তে, প্রত্যেক অবস্থায়, প্রত্যেক পরিস্থিতিতে আমীরের আনুগত্য করতে হবে। কিন্তু কিছু সাহাবা (রা.) যারা খোদা তাআলার আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহচর্যে থেকে সর্বাধিক কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন তারা এ আদেশ মানতে অস্বীকার করলো। ফলশ্রুতিতে আলোচনার পর কেউ এ আদেশের ওপর আমল করলো না। কেননা এটা আত্মহত্যার শামিল ছিল। আর ইসলামে আত্মহত্যা হারাম–নিষিদ্ধ। এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিবরণ। তখন অনেক আদেশ-নিষেধ স্পষ্ট ও বিস্তারিত ছিল না। কিন্তু এ ঘটনার পর আঁ হযরত (সা.) কোনটি ন্যায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আজ কাল এমন লোক আছেন, যারা বিভিন্ন ধরনের আপত্তি করে থাকেন। তারা এরূপ কথা বলে থাকেন, তিনি এমন একজন ভাল কর্মকর্তা ছিলেন। অথচ তাকে সরিয়ে অন্য কাউকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। খলীফায়ে ওয়াক্ত জামা'তী ব্যবস্থাপনায় চরম ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা নিশ্চিতভাবে একটি অন্যায় আদেশ। তারা তো আর কোনকিছু করতে পারে না। এই জন্য মনে করে, যেহেতু এটি একটি ন্যায়সঙ্গত বাক্য নয় তাই নিজেরাই ব্যাখ্য করে বলতে থাকে–এই ব্যাপারে আমাদের কথা বলার এবং বিভিন্ন স্থানে বসে উচ্চ বাচ্য করার অধিকার আছে। তাই আমি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় এ কথা বলে দিচ্ছি "যত্র-তত্র যে কোন অবস্থায় জামা'তী নিযামের বিরুদ্ধে কারো কোন কথা বলার কোন প্রকার অধিকার নেই।"

এ সম্পর্কে আমি পূর্বেও অনেক কথা বলেছি। তোমাদের একমাত্র কাজ হল আনুগত্য করা। আনুগত্যের কষ্টিপাথর কিরূপ হওয়া উচিত হাদীসের আলোকে আমি এ বিষয়টি স্পষ্ট করব। এরূপ লোকদের সর্বদা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর ঘটনাকে সামনে রাখা উচিত। এক যুদ্ধে হযরত ওমর (রা.) সেনাপতির পদ থেকে তাঁকে পদচ্যুত করে হযরত আবু উবাইদা (রা.)কে সেনা প্রধানের দায়িত্ব অর্পন করেন। হযরত আবু উবাইদা (রা.) যখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)কে অত্যন্ত যোগ্যতা ও নৈপুণ্যতার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করতে দেখলেন তখন তিনি এমতাবস্থায় তার কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নি। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) যখন জানতে পারলেন হযরত উমর (রা.) এ আদেশ জারি করেছেন সাথে সাথে তিনি হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) এর কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন, যেহেতু খলীফায়ে ওয়াক্ত স্বয়ং এ আদেশ জারি করেছেন আপনি এখনই দায়িত্ব বুঝে নিন। আপনার অধীনে কাজ করতে আমার বিন্দুমাত্র সমস্যা হবে না। আমি আপনার অধীনে সেভাবেই কাজ করবো যেভাবে আমি সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে কাজ করেছিলাম। এটাই হলো আনুগত্যের সর্বোৎকৃষ্ট মান। কোন জেদী/একরোখা ব্যক্তি বলতে পারে হযরত ওমর (রা.) এর সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত ছিল না–এটাও ভুল ধারণা। এ সিদ্ধান্তের মধ্যে এমন কোন বিষয় প্রকাশ পায় নি যা শরিয়ত বিরোধী। আপনারা দেখুন! আল্লাহ্ তাআলাও হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক সিদ্ধান্তের যথাযথ সম্মান রেখেছেন। এ যুদ্ধে এক-এক জন মুসলমান সৈন্যের মোকাবেলায় শত শত শত্রু সৈন্য লড়াই করা সত্ত্বেও মুসলমানরা এ যুদ্ধে প্রবল পরাক্রমে বিজয় লাভ করে।

[দৈনিক আল ফযল ২০ জানুয়ারী ২০০৪]

অনুবাদক : **আহমদ জাকির হোসেন**
ছাত্র, ৪র্থ বর্ষ
জামেয়া আহমদীয়া,বাংলাদেশ

ইসলাম প্রচার প্রসার ও বিস্তারে আহমদীয়াত

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব
মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন

(৩য় কিস্তি)

আমরা আমেরিকার আশেপাশের লোকদের তবলীগ করে মুসলমান বানিয়ে পরে আমেরিকা পাঠব। আমেরিকা তাদেরকে বাধা দিতে পারবে না। আমি আশা রাখি একদিন আমেরিকায় **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"** প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হবেই হবে। (আল ফযল ১৫ এপ্রিল ১৯২০, ১২ পৃ: ৩য় কলামে)

আমেরিকার তবলীগি কেন্দ্র শিকাগোতে ছিল। ১৯৫০ সালে তা শিকাগো থেকে ওয়াশিংটন স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের পর ২০০ বছর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একই বছর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আমেরিকা সফর করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংবাদটি তাৎপযপূর্ণ ছিল যে, সে সময় আমেরিকা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শনের জন্য উন্মুখ ছিল।

হুযূর রাহে বলেন, "আমেরিকায় এজন্য যাচ্ছি যে এ পর্যন্ত সেখানে সিমীত পর্যায়ে সফলতা অর্জিত হয়েছে এবং আরও অনেক কিছু করার আছে। যদিও বিভিন্ন অঞ্চলে সম্ভবনা থাকা সত্ত্বেও কাঙ্খিত সফলতা আসছে না। সেখানে গিয়ে ইসলামের অগ্রগতির জন্য জোর প্রয়াস চালানোই আমার উদ্দেশ্য। যেন আমেরিকার সর্বত্র আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসার নিদর্শন প্রকাশিত হয়। (আল ফযল, ১৫ আগষ্ট ১৯৭৬)

১লা আগষ্ট ১৯৭৬ সালে হুযূর (রাহে.) "ডেটনে" যান। সেখানকার কমিশনার হুযূর (রাহে.)কে শহরের চাবি উপহার দেন। (আল ফযল, ১৪ আগষ্ট ১৯৭৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ১৯৮৭ সালে আমেরিকায় সফর করেন। ৯ অক্টোবর তারিখে ওয়াশিংটনে নতুন মিশন হাউজ ও মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৭ অক্টোবর হুযূর (রাহে.) কলম্বিয়া গমন করেন। কলম্বিয়ার মেয়র এই দিনটিকে "হযরত মির্যা তাহের আহমদ" দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। ৩০ অক্টোবর তারিখে হুযূর (রাহে.) পোর্টল্যান্ডে মসজিদ "বায়তুর রিদওয়ান" উদ্বোধন করেন। সফরকালীন সময়ে হুযূর (রাহে.) ১৯৯৪ সালের ১৪ অক্টোবর মসজিদ "বায়তুর রহমান" এবং MTA -এর স্টেশনের উদ্বোধন করেন।

কানাডা :

১৯১৯ সালে কানাডায় আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছায়। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯৫৬ সালে কিছু আহমদীর সেখানে অভিবাসিত হওয়ার প্রেক্ষিতে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালের ৮ আগষ্ট হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) টরেন্টো সফর করেন। সেখানে হুযূর (রাহে.) জামা'তের কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা দেখে কিছু উপদেশ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

মোকাররম সৈয়দ মনসুর আহমদ ১৯৭৭ সালের ২৬ মার্চ তারিখে কানাডার ১ম মোবাল্লেগ হিসেবে সেখানে পৌছেন। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে টরেন্টোতে একখন্ড জমি ক্রয় করা হয়।

১৯৭৮ সালের অক্টোবর মাসে মিশন হাউজ নির্মাণের লক্ষ্যে ক্যালগারিতে জমি ক্রয় করা হয়। যার উদ্বোধন ২৬ মে ১৯৭৬ সালে করা হয়। ৪-১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস কানাডা সফর করেন। ক্যালগরি জামা'তে কানাডার সর্ব-উত্তরের অধিবাসীদের মাঝে কুরআন মজীদ বিতরণ করেন। হুযুর (রাহে.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কৃত তফসীরের একটি খন্ডে "ক্যালগেরী জামা'ত! আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের কুরআনের অনুবাদ প্রচারে ও প্রসারে স্বীয় সাহায্য ও সমর্থন অব্যাহত রাখুন।"–লিখে ক্যালগেরী জামা'তকে উপহার দেন। (ওকালতে তবশীর কর্তৃক সম্পাদিত তারিখে মিশন, কানাডা পৃষ্ঠা ৩৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ১৯৮৩ সালের ১ম দিকে কানাডা জামা'তকে একটি বিশেষ বাণী প্রদান করেন।..... "কানাডা জামা'ত নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সাবলম্বী হয়ে দাঁড়ানো উচিত। আর নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মিশন হাউজ ও মসজিদ নির্মাণের জন্য নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করাও আবশ্যক। এ কাজে উৎসাহের সাথে নেমে পড়ুন এবং আর্থিক অনুদানের ওয়াদা লেখান।" (ওকালতে তবশীর কর্তৃক সম্পাদিত তারিখে মিশন, কানাডা পৃষ্ঠা ৪৫)

১৯৮৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কানাডা সফর করেন এবং সে সময় ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে হুযূর (রাহে.) মিসিসাগা-য় ১ম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। একই দিন হুযূর (রাহে.)-এর সভাপতিত্বে কানাডা এবং আমেরিকার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এক বিশেষ শূরা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে হুযূর (রাহে.) তাঁর দ্বিতীয় সফরে মসজিদ 'বায়তুল ইসলামের' উদ্বোধন করেন।

২০০৪ সালের ২১ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস কানাডা সফর করেন। এ সময় ২-৫ জুলাই অনুষ্ঠিত জলসায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। হুযূর (আই.) ২০০৫ সালের ৪ জুন থেকে ৬ জুলাই তারিখ কানাডায় দ্বিতীয়বার সফর করেন। ভ্যানক্যুভার-এ প্রথম আহমদী মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর

স্থাপন করেন। এবং ২০০৮ সনের ১৮ জুন তারিখে আলবার্টা-র ক্যালগেরিতে ১ম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। একই বছর ২৪-২৬ জুন কানাডা জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেন। ৩০ জুন প্রধানমন্ত্রী জন মার্টিনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১ জুলাই হুযূর (আই.) "কানাডা দিবস" উদযাপন অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন, ২ জুলাই ব্যাম্পটন-এ মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

কেনিয়া

১৮৯৬ সালে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবদ্দশায় তাঁর দুইজন সাহাবী হযরত মুন্সী মুহাম্মদ আফযাল সাহেব (রা.) এবং হযরত মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) উগান্ডা রেলওয়েতে চাকুরি নিয়ে কেনিয়ার মোম্বাসা পৌঁছান। তাঁরা পূর্ব আফ্রিকায় গমনকারী ১ম আহমদী ছিলেন। একই বছর আরেকজন সাহাবী ডা. মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব গরিয়ানবি (রা.) সেনাবাহিনীতে ডাক্তার হিসেবে যোগদান করে সেখানে পৌঁছান। তার তবলীগ সেখানে আহমদীয়াত বিস্তৃত লাভ করতে থাকে। তাঁর প্রচেষ্টায় হযরত ডা. রহমত আলী (রা.), হযরত ডা. রওশন আলী (রা.) এবং হযরত পীর বরকত আলী (রা.) আহমদী হোন। জামা'তী রেকর্ড অনুযায়ী ১৯০১ সাল পর্যন্ত সেখানে ৫০ এর অধিক সাহাবীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৯২৩ সালের শুরুতে নাইরোবী জামা'তের পক্ষ থেকে "আল বালাগ" নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশনা শুরু হয় যা পরবর্তীতে সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশ হতে থাকে। ১৯২৫ সালে নাইরোবী হল রুম ক্রয় করা হয়। যা জামা'তী কার্যক্রম এবং নামায আদায়ে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯২৮ সালে মসজিদ ও মিশন হাউজ নির্মাণের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩ একর জায়গা জামা'তকে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। ১৯৩০-৩১ সালে এ জায়গায় মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়। (তারিখে আহমদীয়াত, ৭ম খন্ড ২৬৪ পৃ:)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মোকাররম শেখ মুবারক আহমদ (রা.) সাহেবকে পূর্ব আফ্রিকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ১৯৩৪ সনে সেখানে পৌঁছে যুগান্তকারী কাজ করার তৌফিক লাভ করেন।

১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে মোম্বাসা থেকে "Mapenzi Ya Mangu" নামে সোহেলী ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নির্দেশে মোকাররম শেখ মোবারক আহমদ (রা.) ১৯৩৬ সালে ১৫ নভেম্বর তারিখে সোহেলী ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ শুরু করেন যা ১৯৪৩ সালের ৩ মে তারিখে সম্পন্ন হয়। ১৯৫৩ সালে এটি প্রকাশিত হয়। ঐ অনুবাদের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) একটি ঈমান উদ্দীপক বাণী প্রদান করেন। এই বাণীতে তিনি আফ্রিকার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন–

"হে আফ্রিকার অধিবাসীরা! আরও একবার নিজেদের উত্তম গুণাবলীর প্রমাণ দাও। এবং আবারো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা খোদার পক্ষ থেকে আগত সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা প্রবণ হও। এই সত্যকে গ্রহণ না করলে কৃতদাস জাতি মুক্তি পেতে পারে না; অত্যাচারিত অত্যাচারী থেকে বাঁচতে পারে না, বন্দি শৃংখল মুক্ত হতে পারে না। আমি তোমাদেরকে সৌহার্দ ও সমৃদ্ধির পথে আহ্বান জানাচ্ছি।

এটি নিছক আমার কথা নয়। বরং এটি আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি কর্তা আমাদের প্রেমাস্পদ খোদার বাণী। হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় এগিয়ে আস এবং এই সত্য পতাকা তলে সমবেত হও, যেন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে খোদা তাআলার সাম্রাজ্য বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, খোদা তাআলার ন্যায় বিচার পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে আমার কথা মান্য করার তৌফিক দান করুন।

আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা আমি যেন আমার জীবদ্দশায় আপনাদের সবাইকে শান্তি সৌহার্দ সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রচেষ্টারত দেখতে পাই এবং আল্লাহ্ যেন আপনাদের প্রচেষ্টাসমূহকে কবুল করেন।"

খাকসার মির্যা মাহমুদ আহমদ

[শেখ মোবারক আহমদ (রা.) কর্তৃক প্রণীত "ক্যায়ফিয়াতে যিন্দেগী", পৃ: ৯২-৯৩]

আমেরিকার প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান মিশনারী ডা. বিলি গ্রাহাম ১৯৬১ সালে আফ্রিকার প্রচারকার্যে এসেছিলেন। আমেরিকার গণমাধ্যমগুলো এই সফরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। মোকাররম শেখ মোবারক আহমদ (রা.) ১৯৬১ সালে ৩ মার্চ ডা. বিলি গ্রাহামের নামে একটি পত্র লিখেন। যাতে ইঞ্জিলের বরাতে নিরাময় অযোগ্য রোগীকে উল্লেখ করে এ বিষয়ে ইসলামের সাথে খৃষ্টীয় মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য তাকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। দেশীয় গণমাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। ডা. গ্রাহামের কাছে প্রশ্ন করা হয় আপনি কি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছেন? উত্তরে মি. গ্রাহাম বলেন, "আমার কাজ শুধু বক্তৃতা করা আর রোগীদের আরোগ্য করা নয়"।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৮ সালের ৩১ আগষ্ট তারিখে "শায়েন্দা" মসজিদের উদ্বোধন করেন। এবং মিশন হাউজ ও মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১ সেপ্টেম্বর হুযূর (রাহে.) আহমদীয়া কবরস্থানে যান এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের কবর যিয়ারত করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) ২০০৫ সালের ২৮ এপ্রিল কেনিয়ার জলসা সালানা উদ্বোধন করেন। ৩০ এপ্রিল নোয়াশা এবং নাকোরো-তে একটি করে মসজিদের ভিত্তি রাখেন। একই দিন সন্ধ্যায় হুযূর (আই.) এলডরেট-এ একটি মসজিদের উদ্বোধন করেন। ১ মে হুযূর (আই.) শায়েন্দা-য়

আহমদীয়া হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

তাঞ্জানিয়া

১ম দিকে পূর্ব আফ্রিকার ৪ টি দেশ কেনিয়া, উগান্ডা, টাঙ্গানিকা এবং জানজিবার একজন মোবাল্লেগের প্রচারাধীন ছিল। ১৯৬১ সালের ১ মে থেকে এই দেশ সমূহের তবলীগি কার্যক্রম পৃথক করে দেয়া হয়। টাঙ্গানিকা এবং জানজিবার (যা পরবর্তীতে তাঞ্জানিয়া নামে একটি দেশে পরিণত হয়)-তে মোবাল্লেগ ইনচার্জ হিসেবে মৌলভী মোহাম্মদ মোনোয়ার সাহেবকে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে মোকাররম শেখ আমরী উবাইদী সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর মোবাল্লেগ হিসেবে কাজ করা শুরু করেন।

তিনি দারুস সালামের মেয়র এবং আইনমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬৪ সনের ৯ অক্টোবর তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে সম্পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় আহমদীয়া কবরস্থান 'টাবোরা'-এর কিত্তায়ে মুসীয়ান–ওসীয়াতকারীদের জন্য নির্ধারিত স্থান–এ সমাহিত করা হয়। তাঁর নামাযে জানাযায় টাঙ্গানিকার প্রেসিডেন্ট, কেনিয়া ও উগান্ডার অধীন মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪২ সালের ২৭ জুন তারিখে টাবুরা-তে আহমদীয়া মসজিদ দখলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। তাঞ্জানিয়ার রাজধানী দারুস সালাতে ১৯৫৫ সালে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। যা ১৫ মার্চ ১৯৫৭ সালে উদ্বোধন করা হয়। আহমদী মোবাল্লেগ মোহতরম আব্দুর রশিদ রাজী সাহেবকে টাবুরা ডস্‌রকাট-এ সামাজিক সেবার জন্য তাঞ্জানিয়ার সরকার "Jutice of peace" হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৯৮৩ সনে মোরোগোরো-তে **তাহের মিশনারী ট্রেনিং কলেজ** খোলা হয়। এটি চতুর্থ খিলাফতকালের ১ম মিশনারী কলেজ। এ বিষয়ে হুযূর (রাহে.) বলেন, "এ খবর জেনে আমি অনেক আনন্দিত হয়েছি যে, মোরোগোরো তাঞ্জানিয়ায় মিশনারী ট্রেনিং কলেজের যাত্রা শুরুতে আমি খুবই আনন্দিত। আল্লাহ্ তাআলা একে আশিষমন্ডিত করুন এবং সফলতা দান করুন। আর এই কলেজ থেকে হাজারো মোবাল্লেগ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে জগৎবাসীকে সত্য পথ প্রদর্শনে সফলকাম হোক।"

১৯৮৬ সনের ১৫ এপ্রিল তারিখে জামা'তের প্রতিনিধি দল তাঞ্জানিয়ার প্রেসিডেন্ট Mr. Ali Hassan Mwinyi-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে ইংলিশ ও সোহেলী ভাষায় অনুবাদকৃত কুরআন মজীদ উপহার দেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ১৯৮৮ সনের ৮-১৫ সেপ্টেম্বর তাঞ্জানিয়া সফর করেন। ১২ সেপ্টেম্বর মোরোগোরাতে ডিসপেনসারী উদ্বোধন করেন এবং কিসনাওয়া'তে হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন করেন। ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে হুযূর (রাহে.) ডোডা-তে মসজিদের উদ্বোধন করেন। একই দিন হুযূর (রাহে.) মরহুম শেখ আমরী উবাইদী সাহেবের কবর যিয়ারত করেন। সেই দিনই হুযূর (রাহে.) "প্রাইমিনিষ্টার হাউজে" তাঞ্জানিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হুযূর (রাহে.) জামা'তের উদ্দেশ্যে বলেন, "সাহস এবং অধ্যবসায়ের সাথে অগ্রসর হও এবং সারা দেশে আহমদীয়াতের বিস্তৃতির জন্য বদ্ধ পরিকর হও।

এখন আপনারা ১০ হাজারের মত সদস্য রয়েছেন কিন্তু আমার দ্বিতীয়বার আগমনকালীন সময়ে এ সংখ্যা ১০ লক্ষে উপনীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ২০০৫ সালের ৮ মে হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.) তাঞ্জানিয়া গমন করেন। ৯ মে হুযূর (আই.) তাঞ্জানিয়ার জলসায় অংশগ্রহণ করেন। ১৩ মে তারিখে তাঞ্জানিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং ১৪ মে তারিখে দেশের প্রেসিডেন্ট Mr. William M Kapa -এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। একই দিন হুযূর (আই.) মোরোগোরো রিজিওনের নতুন মিশন হাউজের উদ্বোধন করেন। ১৫ মে তারিখে মোরোগোরো থেকে ২৫০ কি.মি. দূরে শালজে-তে মসজিদ উদ্বোধন করেন।

উগান্ডা :

উগান্ডা রেলওয়েতে চাকুরীরত হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দু'জন সাহাবীর মাধ্যমে ১৮৯৬ সালে উগান্ডাতে আহমদীয়াতের বীজ রোপিত হয়। ১৯৫৯ সালে সর্বপ্রথম উগান্ডার জিনজা-য় মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। মোকাররম মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সনের ১৫ মার্চ যখন তাঞ্জানিয়ার দারুস সালামের মসজিদ ফযল'-এর উদ্বোধন হয় তখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

"আমি উগান্ডায়ও মসজিদ নির্মাণের সুসংবাদ শোনার অপেক্ষায় আছি।"

হুযূর (রা.) এর এই ইচ্ছানুযায়ী ১৯৫৭ সালের ৯ আগষ্ট তারিখে উগান্ডার কামপালায় **'মসজিদ মাহমুদ'** -এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়।

উগান্ডায় ১৯৮৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর **'নুরুদ্দিন মিশনারী ট্রেনিং কলেজ'**-এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে জামা'তের একটি প্রতিনিধিদল উগান্ডার প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে কুরআন মজীদ ও ইসলামী নীতিদর্শন পুস্তিকা উপহার প্রদান করেন। কুরআন মজীদ গ্রহণ করে তিনি বলেন, "It is a good book" –এটি একটি উত্তম কিতাব। ১৯৮৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর তারিখে উগান্ডার প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে কুরআন মজীদ উপহার দেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৮ সালের ৩-৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উগান্ডা সফর করেন। ৬ সেপ্টেম্বর হুযূর

(রাহে.) উগান্ডার প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.) ২০০৫ সালের ১৭-২৫ মে উগান্ডা সফর করেন। ১৯ ও ২০ মে জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেন। সে সময় হুযূর (আই.) উগান্ডার প্রেসিডেন্ট এর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। ২১ মে বুসিয়া (Busia)-তে মসজিদের উদ্বোধন করেন।

মরিশাস :

মরিশাসের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক নূর মোহাম্মদ সাহেব ফ্রেঞ্চ ভাষায় "The Islamism" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। Reviw of Religions-এর সম্পাদক ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত "The Crescent" নামক পত্রিকায় Islamism পত্রিকার কথা পড়ে নূর মোহাম্মদ সাহেবকে "Reviw of Religions"-এর কয়েকটি কপি পাঠান। ১৯০৫ সালে এই দ্বীপে (যা পৃথিবীর একটি প্রান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়) আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছায়। ১৯১২ সালে নুর মোহাম্মদ সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তাঁর মাধ্যমে এই বাণী আরও বিস্তৃতি লাভ করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর নির্দেশে সুফী গোলাম মোহাম্মদ সাহেব বি.এ ১৯১৫ সালের ১৫ জুন তারিখে মরিশাস যান। ১৯২৩ সনে এই দ্বীপে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। ১৯১৭ সালে হাফেয ওবায়দুল্লাহ্ সাহেব মোবাল্লেগ সিলসিলাহ্ মরিশাস পৌঁছে সুফী সাহেবের সহযোগিতায় নিয়োজিত হোন।

১৯২৩ সালে হাফেয ওবায়দুল্লাহ্ সাহেব মারা যান এবং তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মোকাররম হাফেয জামাল আহমদ সাহেবকে ১৯২৮ সালের ২৭ জুলাই তারিখে মরিশাসে পাঠান। তিনি ১৯৪৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর সেখানেই মারা যান এবং তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মরিশাস সফর করেন। কোন খলীফাতুল মসীহ্র এটাই প্রথম সফর। ১৯৮৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর হুযূর (রাহে.) "New groove" -এ মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং মিলিটারী কোয়ার্টার মসজিদের উদ্বোধন করেন। ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে হুযূর (রাহে.) মরিশাসের গভর্ণর জেনারেল এর প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরে হুযূর হাফেয জামাল আহমদ সাহেব এবং হাফেয ওবায়দুল্লাহ সাহেবের কবর যিয়ারত করেন। ১৯93 সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) দ্বিতীয়বার মরিশাস সফরকালে একদিন "Rodrigues" দ্বীপে যান এবং সেখানে জামাতের সদস্যদের দেখে আনন্দিত হোন। পরিবারগুলোর সাথে সাক্ষাৎকালীন সময়ে বলেন, "আসুন এখন দূরবর্তী দ্বীপসমূহে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর জামা'তের সদস্যদের সাথে মিলিত হই।" ২০০৫ সালে ২৮ মে নভেম্বর তারিখে খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) ১৩ দিনের সফরে মরিশাসে পৌঁছান। ২৯ নভেম্বর হুযূর (আই.) মরিশাসের প্রেসিডেন্ট এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর মরিশাসের জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেন এবং তিন দিনই বক্তব্য প্রদান করেন। ২০০৫ সালের ৬ ডিসেম্বর হুযূর (আই.) Laferme-তে আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। (চলবে)

[তাহরীকে জাদীদের খিলাফত শতবার্ষিকী স্মরণিকা অবলম্বনে]

ওয়াকফে জাদীদের কল্যাণমন্ডিত কর্মসূচীতে অংশ নিন

৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ ওয়াকফে জাদীদের বছর শেষ হতে যাচ্ছে বিধায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সকল স্থানীয় জামা'তের আমীর ও প্রেসিডেন্ট সাহেবগণকে নিম্নোক্ত বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে–

(১) ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা ও চাঁদা আদায়ে জামা'তের কোন সদস্যই যেন বাদ না যায়।

(২) এমনকি নবজাত শিশুকেও এ চাঁদায় শামিল করতে হবে।

(৩) এই চাঁদায় অংশগ্রহণকারী জামা'তের সদস্যগণের তালিকা তিন ভাগে তৈরী করতে হবে।

(ক) ১২ বছর বা তার কম বয়সী শিশুদের চাঁদা আদায়ের বিবরণ সম্বলিত একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

(খ) ১২ বছরের বেশী বয়সী সদস্যদের চাঁদা আদায়ের বিবরণের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

(গ) ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়ে সকল নও মোবাইনকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাদের থেকে চাঁদা আদায় করে এর একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়ের বিবরণী সম্বলিত উক্ত তিন প্রকারের তালিকা প্রস্তুত করে আগামী ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বরাবরে প্রেরণ করতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হলো যাতে উক্ত তালিকা দোয়া লাভের উদ্দেশ্যে হুযূর (আই.) এর খিদমতে নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে পেশ করা যায়।

জাযাকুমুল্লাহ্! আহসানুল জাযা।

নিবেদক

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল

ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ওয়াকফে জাদীদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত. বাংলাদেশ।

সত্যের সন্ধানে

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

মানবাত্মা তার অবচেতন মনেই সত্যের পিয়াসী। সত্যের প্রেমে সে আসক্ত। যদিও বা কোন নরাধম কখনও কখনও ঈর্ষান্বিত হয়ে কিংবা উপেক্ষা করে তা এড়িয়ে চলে। ইহা নিছকই সেই দুষ্ট আত্মার কুকর্ম। সত্যকে খুঁজে পাওয়া এবং তার সন্ধান লাভ করা কোন মানুষের জন্য যে কত আনন্দের এবং কত সাফল্যের তা ভাষায় বর্ণনাতীত। সত্যের প্রভাবে মানুষ আলোকিত হয়, পবিত্র হয়ে তাক্ওয়া সমৃদ্ধ হয় এবং পরিশেষে সে খোদামার্গে পৌঁছে, যার পরিণতিতে সে খোদা সত্তায় মিশ্রিত হয়ে যায়। আত্মার এমতাবস্থায় খোদা বলেন, "আমি তোমার সাথে আছি এবং আমি সেখানেই দাঁড়াই যেখানে তুমি দাঁড়াও" (ইলহাম হযরত মসীহে মাওউদ আ.)। তিনি আরো বলেন, "তাহার হাত খোদার হাত যাহা তাহাদের হাতের ওপর রহিয়াছে" (৪৮ : ১১)। 'তুমি যাহা নিক্ষেপ করিয়াছিলে তুমি নহে বরং খোদা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন" (৮ : ১৮)। বিশেষ কোন আত্মা যদি বিশিষ্ট এহেন মর্যাদায় উপনীত হয় তখন তার শান ও মাকাম কী আর কল্পনায় সীমাবদ্ধ করা যায়? তিনি দুনিয়াতে থেকেও আকাশের নিয়ন্ত্রণে চলেন, তিনি বলেন বটে কিন্তু বলেন তা, খোদা তাঁকে যা বলতে বলেন, তিনি শুনেন বটে কিন্তু খোদা তাঁকে শ্রবণ করতে বলেন, আপাত দৃষ্টে তাঁকে একা মনে হলে মোটেই তিনি একা নন বরং শত ফেরেশ্তার বেষ্টনীতে তিনি পূর্ণ হেফাযতে দিনপাত করেন। এমন কোন কর্ম নেই যা খোদা তাঁর পক্ষে করতে প্রস্তুত নহেন। তিনি ঘুমিয়ে থাকেন কিন্তু পরম সত্তা খোদা তাঁর সাহায্যে জাগ্রত থাকেন। তিনি হাসেন বটে কিন্তু খোদা তাঁর দিকে দৌঁড়ে আসেন। তিনি তাঁর যাবতীয় পরিকল্পনাকে সফলতায় পরিণত করেন। তাঁকে সর্বাবস্থায় বিজয়ী না করা পর্যন্ত খোদা তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কভু ক্ষান্ত হন না, এ পর্যায়ে তাঁর শান ও সম্মান এতটাই শীর্ষে উপনীত হয় যে, পরিশেষে দুরাচার দুবৃত্তগণ সে জ্যোতি দর্শন করতে গিয়ে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে।

বলতে কী, সত্য অবশ্যই এতটা জ্যোতির্ময় এবং তা মানুষকে নি:সন্দেহে আধ্যাত্ম সফলতার শীর্ষে পৌঁছে দেয়। যদি তা-ই হয়, তবে সে সত্য কামনায় কে না নিবেদিত হবে? যদি বা কেউ তা প্রাপ্ত হওয়ার সাধনায় উদাসীন হয় তবে সে ভাগ্যহত, সে আদৌ খোদা ভক্ত নহে বরং খোদা পরিত্যক্ত, সে জীবিত নহে মৃত, সে চক্ষুষ্মান নহে অন্ধ, তার দ্বারা পৃথিবী কখনও লাভবান হতে পারে না বরং পৃথিবীতে অনর্থ অন্যায় সৃষ্টি করাই হবে তার কাজ। কিন্তু মানুষ এমনিতর কর্ম সাধন পূর্বক পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার এমন কোন অভিপ্রায় থাকতে পারে না ইহা আমাদের সবারই সন্দেহাতীত প্রত্যয়। পবিত্র কুরআনে খোদার উক্তি হলো, "হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেকেই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে আগামী কালের জন্য সে অগ্রে কী প্রেরণ করিয়াছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কর্মই কর উহা সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন" (৫৯ : ১৯)। অতএব প্রতিটি মানুষেরই উচিত হবে সে যেন খোদা প্রদত্ত পথ প্রাপ্তির নিমিত্তে ক্লান্তিহীন কর্ম প্রচেষ্টা চালায় এবং জীবনের সর্বস্ব তৎকাজে বিনিয়োগ করে, অভীষ্ট এই লক্ষ্য অর্জন না করা পর্যন্ত মানুষ কখনও ক্রন্দন থেকে বিরত থাকতে পারে না, তার পদযুগলকে কখনও ক্রন্দন থেকে থামাতে পারে না। এমনকি মৃত্যুর জন্যও প্রস্তুত হতে পারে না। এর জন্য অতীতকে বিশ্লেষণ করা দরকার, সেখান থেকে নজীর আহরণ করা দরকার। পরম এই সত্য পেতে চরম সাধনার প্রয়োজন। সেখানে পবিত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জানা দরকার তারা কেন কীভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, ধন বিনিয়োগ করেছেন, সন্তান সন্ততিকে উৎসর্গ করেছেন, স্বীয় ইচ্ছাকে জলাঞ্জলী দিয়েছেন। কারণ ইহা এমনই এক পাওয়া যা পার্থিব ঔশ্বর্যের আড়ম্বরে বসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই ক্ষেত্রে হযত মসীহে মাওউদ (আ.) বলেন, "তোমরা দয়ার যোগ্য পাত্র হও, তাহা হইলে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হইবে, উদ্বিগ্ন হও, সান্তনা পাইবে, পুন:পুন: ক্রন্দন করিতে থাক যেন স্বপ্নেই ঐশী হস্তের স্পর্শ আসিয়া তোমাদিগকে ধারণ করিয়া লয়। খোদা প্রাপ্তির পথ (সত্য পথ) বড়ই দুর্গম। কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বরণ করিয়া অতল গহ্বরে নিপতিত হয়, তাহার জন্য ইহা সুগম হইয়া যায়। (কিশতিয়ে নূহ্) সুতরাং এই পবিত্রতম ও সাফল্যমন্ডিত পথ পেতে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যকুল ব্যাপৃত চেষ্টায় ব্রত থাকা দরকার যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারে যে, তিনি তা প্রাপ্ত হয়েছেন। এর ব্যত্যয় আর দ্বিতীয় উপায় নেই। এ মণি অর্জন করতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নি:শেষিত হয়ে যায় তবু তা ক্রয় করা উচিত।

হে প্রিয় পাঠক! এতক্ষণ আমি আমার কলম প্রচেষ্টায় খুব স্বল্প কথায় সত্য পথ ও সত্য মত লাভের প্রয়োজনীয়তার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। যদি এই অনাথ লেখকের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনি সত্য সত্যই সত্যের সন্ধানী হতে চান তবে আসুন সেই সত্য মত ও সেই সত্য পথ কোথায় কার কাছে পাওয়া যায় তা তালাশ করি। হায়! বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, জামা'তে আহমদীয়া ও তার প্রতিনিধিবৃন্দ বিগত শতাব্দি অধিক সময় ধরে আহাজারি করে সেই পথের সন্ধান দিতে আহ্বান করছে। তারা তাদের ধনসম্পদ নিজ প্রাণ ও সন্তান সন্ততিদিগকে উৎসর্গ করে, বহু অর্থ ব্যয়ে বহু কিতাবাদি রচনা করে বহু সভা-সমাবেশ ও বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে সত্যের সন্ধান দিতে ডাকছে। কিন্তু কৈ? জগত মোহে মত্ত মানুষ মোটেই তৎপ্রতি কর্ণপাত করছে না বরং উল্টো নানাভাবে তাদেরকে কঠোর আচরণে নির্যাতন করে সে মহৎ কর্ম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু হে নির্বোধগণ! মাথায় মাথাল ধরে কখনও সূর্যের আলোকে আড়াল করা যায় না। মহাশক্তিধর সূর্য আপন আদলে ধীরে পৃথিবীগায় তার আলো বিচ্ছুরিত করেই থাকে। (অবশিষ্টাংশ ৩০ পৃষ্ঠায়)

পবিত্র হৃদয়ই কেবল পবিত্রময় সত্তাকে পেতে পারে

মাহমুদ আহমদ সুমন

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র। আর তিনি পবিত্র হৃদয়ের অধিকারীদেরকে এক মায়ের চেয়েও বেশি ভালবাসেন। যারা পবিত্র তাদেরকে তিনি সর্বদা তাঁর রহমতের চাদরে আবৃত করে রাখেন। দুনিয়ার কোন শক্তি তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। অপর দিকে অপবিত্ররা তাঁর হেফাজতে থাকেন না। নানান বিপদাপদ তাদের জীবন সঙ্গি হয়।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এপর্যন্ত পৃথিবীতে যত নবী রাসূলের আগমন ঘটেছে তাঁরা সবাই পবিত্র জীবনের অধিকারী ছিলেন এবং জাতির শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন। তাঁরা সবাই পবিত্র ছিলেন বলেই মহান খোদা তাআলার প্রিয়ভাজন হতে পেরেছেন। প্রকৃত ভাবে আল্লাহকে যারা পেতে চায় তারা তাঁকে পায়।

যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- **'যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পুরো চেষ্টা সাধনা করে, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথের দিকে আসার সুযোগ দেই'** (সূরা আন কাবুত, ৭০)।

সারা বিশ্ব আজ নানান অরাজকতা, বিশৃংখলা, যুদ্ধবিগ্রহে জর্জরিত। মুসলমানরা সর্বত্র মার খাচ্ছে বিধর্মীদের হাতে। বিশ্বময় অবক্ষয়ে নিমজ্জিত হওয়ার অবশ্যই কারন রয়েছে। আর এসবের মূল কারন হল- পবিত্রময় সত্তা মহান আল্লাহ্ তাআলাকে মানুষ আজ ভুলে গেছে। পবিত্র ও পুণ্যবান মানুষের সংখ্যা নাই বললেই চলে। সবাই যেন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আধ্যাত্মিক ভাবে সবাই আজ রোগাক্রান্ত। সর্বত্র এত অবক্ষয় তার পরও খোদা তাআলা কেন তা দূর করছেন না? যে খোদা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময় ছিলেন সেই খোদা কি আজ নেই? খোদা তাআলা পূর্বে কথা বলতেন বর্তমানে কি কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন? নাউযুবিল্লাহ। অনেকে বলেন খোদা এখন আর কথা বলেন না এবং দোয়াও কবুল করেন না।

আসলে এমন যারা মনে করেন তারা শিরকে লিপ্ত। দোয়া গ্রহণকারী বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর যে খোদা পূর্বে ছিলেন সেই একই খোদা আজও আছেন এবং থাকবেন। তিনি আগেও যেমন কথা বলতেন এখনও কথা বলেন, আগে যেমন দোয়া গ্রহণ করতেন এখনও ঠিক তেমনই ভাবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। আজও তাঁকে ডাকলে তিনি উত্তর দেন এবং শুনেন, সকল বিপদাপদ থেকে মুক্ত করেন।

তিনি সর্বদা অপেক্ষা করেন কোন বান্দা তাঁকে স্বরণ করছে এবং তার কি চাহিদা রয়েছে।

যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে- **'এবং আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন করে তখন তুমি বল, আমি নিকটে আছি। প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। অতএব তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় আর আমার ওপর ঈমান আনে, যাতে তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়'** (সূরা বাকারা, ১৮৭)।

আল্লাহ্ তাআলা তাদের দোয়া শুনেন যারা পবিত্র, যারা খাঁটি হৃদয় নিয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকেন তাদের ডাকে তিনি অবশ্যই উত্তর দেন। খোদাতো পৃথিবীর সব অরাজকতা দেখছেন কিন্তু দেখা সত্বেও তিনি তা দূর করছেন না এর কারণ হল কার ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি এসব করবেন? এমন পবিত্র আহ্বানকারীর আজ বড়ই অভাব। মুখে যতই আল্লাহ রাসূলের নাম নেই না কেন অন্তরতো আমাদের পবিত্র না। আল্লাহ্ তাআলা অন্তরের খবর জানেন। যেভাবে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, হজরত রসূল করিম (সা.) বলেছেন- 'আল্লাহ বান্দার চেহারা ও পোষাকের দিকে দৃষ্টি দেন না বরং তিনি বান্দার হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি দেন'। জুব্বা-জামা আর চেহারা যত ভালই হোক না কেন হৃদয় যদি পবিত্র না হয় তাহলে খোদা তাআলার সন্তুষ্টি কোন মতেই লাভ করতে পারব না।

তাই আমাদেরকে নিজেদের অন্তরের পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা লাভের উদ্দেশ্যে যুগ-ইমামের আনুগত্যের জোয়াল স্কন্ধে ধারণ করে প্রতিনিয়ত সাধনায় রত থাকতে হবে তবেই আমরা আকর্ষিত করতে সক্ষম হবো আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ অনুকম্পা।

মহান খোদা তাআলা পবিত্র সত্তা। তাঁকে পেতে হলে তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দা হতে হবে এবং নিজে পবিত্র হতে হবে। আল্লাহ্ তাআলাআমাদের সকলকে পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

ঈদ মুবারক

পবিত্র ঈদুল আযহিয়া উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক -লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মুবারক।

পবিত্র ঈদুল আযহিয়া সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ ও আনন্দ।

–সম্পাদক

খিলাফত হারা মুসলমানদের অমানবিক কর্মকান্ড

সংগ্রহ : ডা. শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ

জনৈক কবি বলেন–
খিলাফতহীন–খলিফা বিহীন
কভু নাহি চলে দ্বীন।
খিলাফত হারা খলীফা ছাড়া
রয়না কোন ধর্ম খাড়া।

কবির ভাষায় বলতে গেলে অবশ্য বলতে হয়–
সত্যের কাছে মিথ্যার পরাজয়
ইতিহাস কথা কয়।

আসুন এবার আমরা দেখি ইতিহাস কী বলে? দয়া করে একটু লক্ষ্য করুন–

মিসর প্রাচীন সভ্যতার আবাস ভূমি। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাযি.)-এর সময় মিসর মুসলমানদের অধিকারে আসে। সেই সময় থেকেই খলীফাগণ এই দেশ গভর্ণর দ্বারা শাসন করতেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাগদাদের খলীফাগণ যখন দুর্বল হয়ে পড়েন, তুর্কী গভর্ণরগণ বেশ কিছুদিন সেখানে স্বাধীনভাবে শাসন চালাতে থাকেন। এর তিন শতাব্দী পর আয়ুবীয় সালাহউদ্দিন মিসরের সুলতান হন। ক্রুসেডের বা ধর্ম যুদ্ধের যুগে সালাহ উদ্দিন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

মামলুকদের উৎপত্তি

বিশ্বের ইতিহাসে ক্রীতদাসরা রাজ্য শাসন করিয়াছেন এরূপ কোন নজীর পাওয়া যায় না। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে ক্রীতদাসরা রাজ্য শাসন করিয়াছেন এরূপ দুইটি বংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি ভারতীয় উপমহাদেশের কুতুবউদ্দিন আইবক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত দাস বা মামলুক বংশ এবং অপরটি মিসরের মামলুক বংশ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মালেকউস্সালেহ নামে সুলতান সালাহ উদ্দীন আয়ুবের একজন বংশধর মধ্য এশিয়া হইতে হাজার হাজার তুর্কী ক্রীতদাস ক্রয় করে মিসরে চলিয়া আসেন এবং তাদেরকে স্বীয় দলে সংগঠিত করেন। এই দাসদেরকে মামলুক বলা হত। মামলুক শব্দের অর্থ ক্রীতদাস। মামলুকদের প্রথমে দেহরক্ষী বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। তারা অসীম সাহসী ও কষ্ট সহিষ্ণু ছিল। কালক্রমে এই মামলুক শক্তিশালী হয়ে উঠে। তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পি, কে, হিট্টি বলেন, "বিগত দিনের ক্রীতদাস আজিকার প্রধান সেনাপতি এবং আগামী দিনের সুলতান (সম্রাট) হয়ে বসিত" আয়ুবীয় বংশের দুর্বলতাঁর সুযোগে মামলুকরা তাদের নিজেদের মধ্য হতে একজন মিসরের সুলতান পদে স্থাপন করে। এই ভাবে তারা ক্ষমতায় আসে এবং মিসরে মামলুকদের শাসন কাজ শুরু হয়। মামলুক দুই শেণীতে বিভক্ত ছিল। বাহরী মামলুক ও বুরুজী মামলুক। আয়ুবীয় সুলতান আস-সালেহর ক্রীতদাসদিগের মধ্য হতে বাহ-ারী মামলুকদের উৎপত্তি হয়। তিনি এই সমস্ত ক্রীতদাসকে দেরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং নীলনদের রওজা দ্বীপাঞ্চলের সেনা-নবাসে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। বাহারে বারিক বা নদী সেনানিবাসে তাহারা বাস করত বলে তাদেরকে বাহারী মামলুক বলা হয়। পরবর্তীকালে এই দেহরক্ষীগণ মিসরে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বাহরী মামলুকগণ প্রধানত: তুর্কী ও মোঙ্গল ছিল।

বাহারী মামলুকদের ন্যায় আর এক শ্রেণীর মামলুক সৈন্য ছিল। বাহরী মামলুক সুলতার কালাউন তাদের ক্রয় করে স্বীয় দেহরক্ষী হিসাবে সৈন্যদের নিয়োগ করেন। এই সমস্ত মামলুকদের অধিকাংশই ছিল কারকাসীয় দেশের অধিবাসী এবং তারা নগর দুর্গের সুউচ্চ গুম্বুজে বা বুরুজে (Twen) বাস করত বলে তাদেরকে বুরুজী মামলুক বলা হয়। এই দুই শ্রেণীর মামলুকদের মধ্যে রাজনৈতিক দিক হতে বাহরী মামলুকদের গুরুত্ব অধিক। কারণ বাহরী মামলুকদের দ্বারাই মিসরের মামলুক বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৪ জন বাহরী মামলুক (১২৫০–১৩৮২ খ্রী:) এবং ২৩ জন বুরুজী মামলুক (১৩৮২-১৫১৭ খ্রী:) মোট ২৬৭ বৎসর মিসরে রাজত্ব করেন।

বাহরী মামলুকগণ ১২৫০–১৩৯০ খ্রী:
'আয়ুবীয় ধ্বংসস্তুপের ওপর সাজার উদ্দার নামে এক বিধবা মহিলা মিসরে এই মামলুক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১২৪৯)। তিনি আসলে এক তুর্কী ক্রীতদাসী ছিলেন। তিনি বাগদাদের খলীফা আল-মুসতাসিমের অন্ত:পুরে একজন ক্রীতদাসী হিসাবে জীবন শুরু করেন। অত:পর তিনি মিসরের আয়ুবীয় সুলতান আস্-সালেহর অধীন হন এবং তাকে বিবাহ করে মুক্তি লাভ করেন। আস-সালেহর মৃত্যুর পর তার একমাত্র পুত্র তুরান শাহ সিংহাসনে আরোহন করবার কিছুদিন পরেই নিহত হন। পুত্রের মৃত্যুর পর সাজার রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মামলুক ছিলেন বলে তাকে মামলুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। মহিলা হলেও তাঁর মধ্যে সম্রাজ্য পরিচালনার মত প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অভাব ছিল না এবং তিনি প্রায় তিন মাস যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সিংহাসন লাভ করবার পর নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন এবং জুমুআর খুতবা পাঠেরও ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সাজার বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেন নি। কারণ–অচিরেই তিনি আব্বাসীয় খলীফা আল্ মুস্তাসিম বিল্লাহর বিরোধিতার সম্মুখীন হন। গাজী সালাহউদ্দিনের রাজত্ব কাল হতেই আয়ুবীয় সুলতানগণ স্বেচ্ছায় আব্বাসীয় খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতেন এবং তার নিকট হতে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করতেন। সুতরাং পূর্ব প্রচলিত রীতি অনুসারে তুর্কী আমীরগণ সাজার উদ্দারের সপক্ষে খলীফার স্বীকৃতি প্রার্থনা করতেন। কিন্তু খলীফা আল মুস্তাসিম তার পূর্বতন ক্রীতদাসীকে সুলতানা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে ঘৃণাবোধ করতেন। তিনি মিসরীয় আমীরদের উদ্দেশ্যে লিখলেন যে, যদি তোমাদের মধ্যে সুলতানাত পরিচালনার জন্য কোন পুরুষ না থাকে তবে আমাদেরকে জানাও আমরা না হয় তার জন্য একজনকে পাঠিয়ে দিব। সাম্রাজ্যের আমীরগণ খলীফার এই পত্র পেয়ে নিজদেরকে খুব অপমানিত বোধ করেন এবং সাজার উদ্দারকে সিংহাসনচ্যুত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অত:পর তারা বাহরী মামলুকদের নেতা এবং রাজ্যের প্রধান সেনাপতি আইবককে তাদের সুলতান পদে মনোনীত করতে চান। অত:পর সাজার বাধ্য হয়ে আইবেককে বিবাহ করে তাকে সিংহাসন

দান করেন। এইভাবে আইবেক বাহরী মামলুকদের প্রথম সুলতান হলেন। আইবেক ১২৫০–১২৫৭ খ্রী: আইবেক একজন সুনিপন বীর ও যোদ্ধা ছিলেন। তিনি রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং কৃতিত্বের সাথে ক্রুসেডারদের আক্রমণকে প্রতিহত করেন। আইবেক সাফল্যের সাথে সিরিয়ার বিদ্রোহ দমন এবং প্যালেস্টাইন ও জর্দানের পশ্চিমাংশ মিসরের অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন। অত:পর তিনি তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি আইবেককে গোপনে হত্যা করেন। এই সকল বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দূর করে তিনি বাগদাদের খলীফার নিকট রাজকীয় উপাধি ও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রার্থনা করেন । কিন্তু এই সময় স্ত্রী সাজার উদ্‌দারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। কারণ সাজার উদ্‌দার ছিলেন উচ্চাভিলাষী মহিলা। তিনি সর্বদাই পর্দার অন্তরাল হতে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করতে চাইতেন। আইবেক স্ত্রীর প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি মুসলের বিদ্রোহী আমীর খুলুকে স্বীয় বশে আনবার জন্য গোপনে তাহার কন্যাকে মাতার অজ্ঞাতে বিবাহের প্রস্তাব দেন। সাজারউদ্‌দার তা জানতে পেরে স্বামীর প্রতি ভয়ানক রুষ্ট হলেন এবং সুপরিকল্পিত ভাবে একদিন তাকে হত্যা করলেন। (১২৫৭ খ্রী:) সাত বৎসর রাজত্ব করবার পর আইবেক নিহিত হন। পরে সুলতানের সমর্থকগণ রানীকে নির্মম ভাবে হত্যা করে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (কুতষ-১২৫৯–১২৬০ খ্রী:) আইবেকের মৃত্যুর পর তার নাবালক পুত্র আল মনসুরকে সিংহাসনে বসান হয়। মামলুক সেনাপতি সাইফ উদ্দিন কুতুষ তার অভিভাবক নিযুক্ত হন এবং সুলতানের পক্ষে শাসনকর্ম পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি ছিলেন বাহরী মামলুক। এই সময় আয়ুবেয়ী বংশের একজন যুবরাজ সিংহাসনের দাবীতে কেরাকে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে কুতুষ তাকে দমন করেন। এতে তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায় এবং সিংহাসন লাভের আকাংক্ষা জাগ্রত হয়। অবশেষে উচ্চাভিলাষী আল মনসুরকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসন অধিকার করে লন। (১২৫৯ খ্রী:)। কুতুষ একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধ তাঁর রাজত্ব কালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে কুতুষ আইন জালুতের যুদ্ধে মোঙ্গলদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। আইন জালুতের যুদ্ধে মামলুক সেনাপতি বাইবাস অপূর্ব বিরত্ব প্রদর্শন করেন। এই বাইবাসহ পরে মিসরের সুলতান হন। সুলতান বাইবার্সের আমলে আব্বাসীয় খিলাফতের পুন:প্রতিষ্ঠাতা ইসলামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। মোঙ্গল নেতা হালাগুখান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হলে মুসলিম জাহান কিছুদিনের জন্য (১২৫৮–১২৬০) খ্রী: খলীফা শূন্য হয়ে পড়ে। বাইবার্স খিলাফতের পুন:প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এর পশ্চাতে তার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও নিহিত ছিল। তিনি আব্বাসীয় খলীফার নিকট হতে স্বীকৃতি লাভ করে মুসিলম বিশ্বের নিকট তার শাসনকে আইন সম্মত মর্যাদা দান করতে চাচ্ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে মোঙ্গলদের ধ্বংসের হাত হতে আব্বসীয় বংশের দুইজন লোক রক্ষা পাইয়াছিলেন। তাদের মধ্যে খলীফা আল জাহিরের পুত্র আবুল কাশেমকে দামেসক হতে এনে আল মুস্তারি বিল্লাহ্‌ উপাধি দিয়ে তিনি তাকে মুসলিম জগতের খলীফা বলে ঘোষণা করেন (১২৬১ খ্রী:)। এর বিনিময়ে তিনি খলীফার নিকট হতে মিসর, সিরিয়া, হেজাজ ইয়াকেন ও ইউফ্রেতিসের ওপর আধিপত্য লাভ করেন। এই ভাবে কায়রোতে মামলুকদের চেষ্টায় আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর প্রায় আড়াই শত বছর ধরে আব্বাসীয় খলীফাগণ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তুরস্কের সুলতান প্রথম সেলিম মিসর জয় করবার পর আব্বাসীয় খলীফা আহমদের নিকট থেকে খলীফা পদ তুলে নিজেই তা গ্রহণ করেন (১৫১৭ খ্রী:)।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক তুরস্কের কামাল পাশা এই সম্মানিত পদ উঠাইয়া দেন। আইন জালুতের যুদ্ধের পর কুতুষ ও সেনাপতি আইবার্সের মধ্যে আলেমপার শাসনাধিকার লইয়া ঝগড়া বাধে। অত:পর ১২৬০ খৃষ্টাব্দের ২৪ অক্টোবর বাইবার্স সুলতানকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন।

বাইবার্স ১২৬০–১২৭৭ খ্রী:

কুতুষের হত্যার পর বাইবার্স নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করলেন। তিনি মামলুক সুলতানদের মধ্যে নি:সন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রথম জীবন তিনি আয়ুবীয় সুলতান খালিকস মালেহর তুর্কী ক্রীতদাস ছিলেন। আল সালেহ তাকে একটি দেহরক্ষী ক্ষুদ্র বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। কিন্তু স্বীয় যোগ্যতার প্রতিভা বলে তিনি সামান্য অবস্থা হতে মামলুক সাম্রাজ্যের সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন। সুলতান হবার পূর্বেই বাইবার্স আইন জালুতের (Ain Jalut) প্রান্তরে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অসামান্য রননৈপুণ্য ও সাহসীকতার পরিচয় দেন। তারই বিরোচিত কর্মের জন্য মুসলমানরা এই যুদ্ধে জয়ী হন এবং এই বিজয়ের ফলে বার্বার মোঙ্গলদের হাত হতে ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষা পায়। ইসলামের ইতিহাসে সেইজন্যই আইন জালুতের যুদ্ধ একটি চূড়ান্তকারী যুদ্ধ। এই যুদ্ধ জয়ের গৌরবের দাবীদার হলেন বাইবার্স। এই যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। এই যুদ্ধে মামলুকরা পরাজিত হলে অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রের ন্যায় মিসরের কায়রো ও মোঙ্গলদের হস্তগত হত এবং ইসলামী সংস্কৃতি বিপদাপন্ন হত। যুদ্ধে মোঙ্গলদের পরাজয়ের ফলে পশ্চিম সীমান্তে তাদের অগ্রগতি চিরতরে বাধাগ্রস্ত হল। এই যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে মিসরীয় ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌ ইনান বলেন, আইন জালুতের যুদ্ধ কেবল মিসর ও ইসলামের ইতিহাস নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই যুদ্ধে ধ্বংসাত্মক তাতার শক্তি প্রাচ্য ও প্রতিচ্যকে সমভাবে বিপদগ্রস্থ করেছিল। তাতারগণ যদি মিসর জয় করতে সমর্থ হত, তাহলে তারা উত্তর আফ্রিকা স্পেন এবং সম্ভবত: ইউরোপের অভ্যান্তরেও প্রবেশ করত এবং যুগপৎ প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের ইসলামী ও খ্রীষ্টীয় সভ্যতা ধ্বংস করে দিত। আইন-জালুতের যুদ্ধে মিসর একই যুদ্ধে ইসলাম ও বিশ্ব সভ্যতাকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। এই মন্তব্যের মধ্যে কিছুটা অতিশয়োক্তি থাকলেও এতে যে আইন-জালুতের যুদ্ধের গুরুত্ব রয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। বাইবার্স ক্রুসেডের বিরুদ্ধে বহু সাফল্যজনক যুদ্ধ করে যশষী হয়ে রয়েছেন। ১২৬৩– ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর তিনি ক্রুসেডের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ক্রুসেডারদের শক্তিকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। ১২৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কারা দখল করেন। অত:পর মেসারিয়া, জাকা, স্রাকাত ও এন্টিয়ক একে একে সুলতান বাইবার্সের হস্তগত হয়। এশিয়ার খ্রীষ্টানদের সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্গ এন্টিয়কের পতন হল। তিনি এদেশে তাদের

প্রাধান্য স্থাপনের মূলে কুঠারাঘাত করিল এবং তদ্বারা তার উত্তরাধিকারীদের ভাবিষ্যত সাফল্যের পথকে প্রশস্ত করেন। ইসলামকে রক্ষার জন্য মোঙ্গল ও ধর্মযুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি ইসলামের দ্বিতীয় সালাহউদ্দীন উপাধি লাভ করেন।

হাসান বিন সাবাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় (Assassins) বাইবার্সের শাসন-ামলে পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। ইতিপূর্বে হালগুখান এই সম্পদায়কে ভীষণভাবে পর্যদস্ত করলে ও তাদের শক্তি নিশ্চিহ্ন করতে পারে নাই। পরবর্তী সময়ে সিরিয়ার মারকাব ও হামাহ্-এর মধ্যবর্তী আনসারিয়া পার্বত্যঞ্চলে নয়টি সুরক্ষিত দুর্গ প্রতিষ্ঠা করে। বাইবার্সের সময় গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় মিসরের জন্য হুমকির কারণ হইলে তিনি তাদের মোকাবিলা করেন। ১২৭০ হতে ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাইবার্স গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে একে একে তাদের দুর্গসমূহ দখল করে লয়। তাদের পরাজয়ে সিরিয়া মামলুক সম্প্রদায়ভুক্ত হল। সিরিয়ার বাইবার্স উত্তর দিকে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তারসাস পর্যন্ত ভূ-ভাগ দখলে আনেন। এর পর তিনি পুনরায় মোঙ্গলদের মোকাবিলা করেন এবং ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বীরা নামক স্থানে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাইবার্স আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং সিস ও আয়াস নামক দুইটি দুর্গ অধিকার করে লন।

এতদ্ব্যতীত, সিলসিয়া তার আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এই সময় সুদানের খ্রীষ্টান শাসক দাউদ মিসরকে নিয়মিত কর প্রদর্শন বন্ধ করে দেন এবং মিসর সীমান্তে আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের বন্দী করে আসওয়ান ও আইযাবে প্রেরণ করেন। ফলে বাইবার্স সুদানের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করেন এবং অনায়াসে সুদান দখল করতে সক্ষম হন। বাইবার্স দাউদের ভ্রাতৃষ্পুত্র সেকান্দরকে নিয়মিত কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে সুদানের শাসন ভার অর্পণ করেন। এই সময় তাঁর সেনাপতি পশ্চিম দিকে বার্বারদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাইবার্স মুবিয়া অধিকার করেন। উত্তর পশ্চিম আফ্রিকাও তাঁর করদরাজ্যে পরিণত হয়। বাইবার্স জীবনের শেষ দিকে এশিয়া মাইনরের সেলজক তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ১২৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাপেদেশিয়ার অন্তর্গত কায়সারিয়ার ওপর আক্রমণ চালান এবং সেলজুক সুলতানের মিত্রশক্তি মোঙ্গলগণকে পরাজিত করে কায়সারিয়া অধিকার করে লন। কিন্তু এখানে তিনি স্থায়ী ভাবে মামলুক শাসন করিতে পারেন নাই। কারণ মোঙ্গল নরপতি আবাগা খানের আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি অবিলম্বে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এর কিছুকাল পরেই বাইবার্স মৃত্যুমুখে পতিত হন। (১লা জুলাই ১২৭৭ খ্রীঃ) (চলবে)

[অধ্যাপক কে. আলী প্রণীত মুসলিম আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস প্রথম খন্ড, পৃঃ ৮৭-৯৩ থেকে উদ্ধৃত]

(২৬ পৃঃ অবশিষ্টাংশ)

এমনিভাবে আহমদী জামা'তও তার মহান প্রভুর অনুমোদনকৃত তাদের পবিত্র আয়োজন ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করতে থাকবে যেমনি ভাবে সূর্য তার কার্য সাধন করে থাকে। পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই যে কিনা তাতে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করেই গত ২৯ অক্টোবর MTA -এর মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'ত সে কার্য ধারা আরো অধিক তৎপরতায় মহা সমরোহে শুরু করেছে। আমরা সকাতরে বন্ধুদের সকাশে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তা দর্শন করতে, প্রশ্ন করতে, বিশ্লেষণ করতে ও ভ্রান্তির আঁচ ধরা পরলে তার প্রতিবাদ করতে। আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য ও তার আওয়াজ মানুষের কর্ণে পৌঁছাতে ও তা গ্রহণ করাতে যত প্রকার কৌশল খাটানোর প্রয়োজন তার প্রত্যেকটার দ্বারাই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব যতক্ষণ পর্যন্ত না পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষকে সেই সত্য ছায়ায় একত্রিত করতে পারব। এরজন্য আমরা যেকোন সময় যারতার সাথে তিনি মুসলমানই হউন আর হিন্দু কিংবা খ্রীষ্টানই হউন শান্তির প্রথায় বিতর্ক করতে প্রস্তুত। আমি জানি খোদাকে লাভ করার চেষ্টায় আমরা কেউ কারোর চেয়ে কম উদ্যোগী নই।

সুতরাং আসুন, হে বন্ধুগণ! যুক্তি ও শুদ্ধ উক্তির বিতর্কে জয়ী হয়ে মুক্তির পথ খুঁজে বের করি। লন্ডস্থ MTA হতে বাংলায় প্রচারিত "সত্যের সন্ধানে" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছি সেই সত্য ধর্ম ও খোদা প্রাপ্তির পথ সন্ধানের। এ দাওয়াত কোন সাধারণ দাওয়াত নয়। এ আহ্বান কোন যেন-তেন আহ্বান নয়। ইহা আকাশকর্তার অসাধারণ কর্মের বিশিষ্ট দাওয়াত এবং তা সবার জন্য। আশা করি সবাই বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। খোদাকে খুঁজে বের করতঃ তাঁর সাদর আলিঙ্গন লাভের চেষ্টায় বেহুঁশ বেকারার দৌঁড়ে আসবেন। পরে যেন অভিযুক্ত হতে না হয়। পরমশ্বেরের দরবার আসনে নিন্দিত হয়ে যেন শিকল বেরিতে ধৃত হয়ে আফসোস করতে না হয়। কেননা বিবেক, বুদ্ধি, শিক্ষা, জ্ঞান, যুক্তি, সুবিচার, সুবিবেচনা, সুচিন্তা ইত্যাদি ও চক্ষু, কর্ণ নাসিকা ও অন্যান্য উপকরণের ন্যায় আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বিশেষ নেয়ামত, এগুলির সঠিক ও উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মূলতঃ এই প্রশ্নের উত্তরের ওপরই নির্ভর করবে আমাদের পুরস্কার বা শাস্তি। বেহেশ্‌ত বা দোযখ। যদি কেউ এর কিছুই করতে প্রস্তুত না থাকেন, খোদার দরগায় সন্তাপ না করেন তবে পরিণামে তা-ই হবে যা খোদা অভিপ্রায়ে রয়েছে, দুনিয়া তাহাকে গ্রহণ করে নাই পরন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং মহাপরাক্রমশালী আক্রমণ সমূহের দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিবেন"। তখনকার সে পরিণতি হবে বড়ই ভয়ঙ্কর, বড়ই নির্মম। **ছাইয়াজাক্কারু মাইয়াখশা ওয়া ইয়াতা যান্নাবুহাল্লাযি আশক্কা.....**

অর্থাৎ যে (আল্লাহকে) ভয় করে সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করিবে। কিন্তু যে একান্ত হতভাগ্য সে ইহাকে এড়াইয়া চলিবে (৮৭ : ১১-১২) প্রত্যেকের সকাশে মহান খোদার এই অমূল্য বাণীটুকু রেখে সবিনয় আরজে বিদায় নিলাম।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এর বাংলাদেশ সফর

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

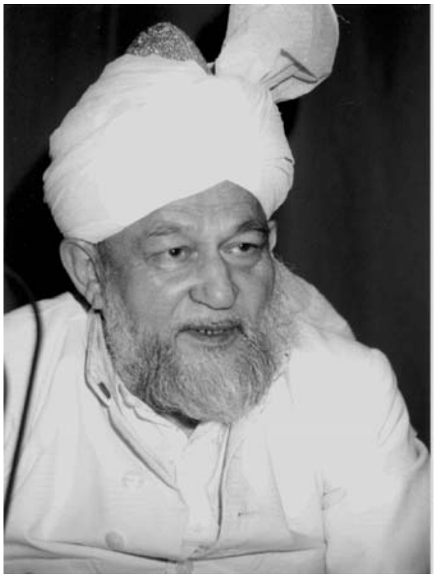

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

(দশম কিস্তি)

আহমদীয়া জামা'তের প্রাদেশিক আমীর মাওলানা মোহাম্মাদ সাহেব তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, সমগ্র বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় অতি নিকটবর্তী। (পাক্ষিক আহমদী ১৫ মার্চ ১৯৬৭)

অতঃপর সদর মির্যা সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিভিন্ন স্থানীয় মজলিস পরিদর্শনে বের হন। রিজিওনাল কায়েদ মুসলেহ উদ্দীন খাদেম সাহেবের সাথে ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বড় বড় মজলিস সফর করেন। বাঙালি যুবকদের জামাতের কাজে সাংগঠনিকভাবে কর্মতৎপরতার শিক্ষা প্রদান করেন। অনেক স্থানে মজলিসের কাজে হাতেখড়ি দিয়েছেন। ফলে খোদ্দামদের মাঝে প্রাণচঞ্চলতা সৃষ্টি হয়। মজলিসের কর্মকান্ডে জোয়ার আসে। মৃত সঞ্জীবনীর কাজ করে। তাঁর পদধুলী লাভকৃত মজলিসগুলি চাঙ্গা হয়ে উঠে। তখন রিজিওনাল কায়েদ খাদেম সাহেব বিশ্ব মজলিসের সদরের নিকট পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক মজলিসকে দু'টিভাগে ভাগ করে দেয়ার আরজ করেন। ফলে সদর সাহেবের মঞ্জুরীতে দু'টি অঞ্চলে বিভক্ত হয়। রিজিওন নম্বর একের কায়েদ মোহাম্মদ আব্দুল খালিদ এবং নম্বর দুইয়ের কায়েদ মুসলেহ উদ্দিন খাদেম নিযুক্ত হন। ফলে এ দেশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কাজে দুর্বার গতি সঞ্চার হয়। তৎকালীন রিজিওনাল কায়েদ নম্বর দুই প্রিন্সিপাল মুসলেহ উদ্দিন খাদেম তাঁর অতিথ দিনের স্মৃতিচারণে বলেন–

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এর সাথে আমার জীবনের কিছু স্মৃতি

"১৯৩৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জামা'তে আহমদীয়ার অভিভাবকদের প্রতি এই বলে তাহরীক করেন–প্রত্যেক আহমদী পিতামাতা তাদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষালাভের জন্য ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ানে প্রেরণ করুন।

হুযূর (রা.)-এর এ তাহরীকে সাড়া দিয়ে আমার শ্রদ্ধেয় মরহুম পিতা গোলাম মাওলা খাদেম, যিনি ১৯১৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন, আমাকে মাত্র ৪/৫ বছর বয়সে কাদিয়ান প্রেরণ করেন।

শিক্ষাজীবনের শুরুতে শ্রদ্ধেয় হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের সাথে তালিমুল ইসলাম হাইস্কুল এন্ড কলেজে আমি সহপাঠী হই। আমি আমার পড়া-শুনার পাশাপাশি ক্রীড়ামোদিতে উৎসাহী ছিলাম। বিশেষ করে ফুটবল ও সাঁতার এবং অন্যান্য খেলায় পারদর্শী হওয়ার জন্য নিয়মিত খেলাধূলায় Perform/Practice করতাম। সাঁতারের দক্ষতা অর্জনের পর ১৯৪৪ সালে 'Punjab Swimming Competition' এ আমি Represent করি। আমি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে Breast stroke & Freestyle প্রতিযোগিতায় ১ম হই এবং পূর্ববর্তী রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করি। তৎকালীন পত্রপত্রিকায় আমার এই সাফল্যের সংবাদ ছবিসহ প্রকাশিত হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় সম্মান প্রদর্শন করেন। আমার এই সাফল্যে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) অভিভুত হয়ে আমাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানান।

তালিমুল ইসলাম কলেজে ছাত্র থাকাকালীন ১৯৪৬ সালে কলেজ কর্তৃপক্ষ 'পর্বত আরোহনের (High King)' প্রতিযোগিতার জন্য এক বিশেষ আয়োজন করেছিল। একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে (প্রফেসর মোহাম্মদ আলী) মির্যা তাহের আহমদ সাহেবসহ আমরা ৮/৯ জন ছাত্র পর্বতে আরোহন করি। উক্ত সময়ে আমার দেশে [তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ] আসার জন্য জরুরী হয়ে পড়লেও তা বাতিল করে সকলের অনুরোধে আমি কুলু পর্বতে আরোহন করি। 'কুলু' পর্বতে সুশোভিত আপেলের বাগান ছিল। আমরা খুব সহজে বাগানে চলে যাই। তখন বাগানে কোন বিধি-নিষেধ ছিল না।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, খাবারের সময় হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) আমাকে আদর করে বলেন 'ইয়ে বাংগালী আচ্ছে তেরে খা লো। ফের মওকা নেহী মিলেগি।' অর্থাৎ হে বাঙালি বেশী করে খাও পরে আর সুযোগ পাবে না।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামা'তের চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর সাথে আমি পত্র যোগাযোগ করি। কিছু পুরানো স্মৃতি চারণ করলে হুযূর আমাকে অত্যন্ত মহব্বত সহকারে উত্তরে লিখেন 'তুমি আমাকে অতীতের কথা মনে করিয়ে দিলে'।

হুযূর রাবে (রাহে.) সম্ভবত: ১৯৬৭ সালে বিশ্ব মজলিসে খোদ্দামুল আহমীয়ার সদর থাকাকালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মজলিস সমূহ পরিদর্শনে আসেন। আমি তখন পূর্ব পাকিস্তনের রিজিওনাল কায়েদ হিসেবে দায়িত্বে নিযোজিত। তিনি বিভিন্ন মজলিসের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে প্রশংসা সূচক মন্তব্য করেন। আমার সুপারিশক্রমে সমগ্র পুর্ব পাকিস্তানের মজলিসগুলোকে দু'টি রিজিয়ন এ বিভক্ত করেন। যার একটি রিজিয়নের দায়িত্ব আমি, অন্যটি মরহুম খালেদ সাহেব পালন করেন।

১৯৮৯ সালে আমি কলেজের চাকুরী ছেড়ে হুযূরের কাছে নিজেকে জামা'তের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করার আকাঙ্খা পেশ করি। তখন হুযূর আমাকে 'নুসরত জাঁহা স্কীমে' অধীনে পশ্চিম আফ্রিকার প্রথমে ঘানাতে প্রিন্সিপাল হিসাবে এবং পরবর্তীতে সিয়েরালিউনে নিযুক্তি দান করেন। আফ্রিকা মহাদেশে থাকাকালে একবার বাংলাদেশ হতে সংবাদ পাই, আমার নাবালক পুত্র সন্তানের একটি হাত দুর্ঘটনায় ভেঙ্গে গেছে। হযূর এর কাছে এ ব্যাপারে দোয়ার আবেদন জানাই। তিনি লিখেন 'আপনার পুত্রের হাত আল্লাহ্‌র অশেষ ফযলে জোড়া লেগে যাবে।' আমার স্ত্রী ২০০০ সালে হৃদযন্ত্রের সমস্যায় অসুস্থ হলে তাঁর কাছে দোয়ার আবেদন করি। হুযূর আকদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন যে, 'আপনার স্ত্রীকে আল্লাহ্‌ তাআলা অলৌকিক ভাবে আরোগ্য দান করবেন।' যা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়। তাঁর দোয়ার ফলে এ রকম আরো বহু মোজেযা আমার জীবনে ঘটেছে।

ঘানা থেকে স্বদেশে ফিরে আসার সময় আমি লন্ডনে স্বল্পকালীন যাত্রা বিরতী করি। আমার সেদিন সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর সাথে দর্শন-মোলাকাতের। লন্ডনস্থ মসজিদে ফযলে নামাযের জন্য অপেক্ষারত থাকা অবস্থায় হুযূর আমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবন্ধন করেন। পরে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীর মাধ্যমে মোলাকাতের ব্যবস্থা হয়। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মোসাহাফা করে অনেক অতীত স্মৃতি চারণ করেন। তখন আমি তাঁর সাথে আবেগাপ্লুত হয়ে যাই। এ রকম আরো বহু স্মৃতি আমার মনে পড়ে, যা স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। MTA-এতে প্রচারিত মোলাকাত অনুষ্ঠানে একজন প্রশ্নকারী হুযূরকে প্রশ্ন করেছিলেন-হুযূর আপনি কিভাবে সাঁতার শিখেছিলেন? আপনার সাঁতার সম্বন্ধে কোন ঘটনা বলবেন কি?

উত্তরে হুযূর বলেন, কাদিয়ানের কাছে দু'টি খাল ছিল, সেখানে আমরা প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে যেতাম এবং সাঁতার শিখতাম। কাদিয়ানের স্কুলে বৃহস্পতিবারে অর্ধেক দিন লেখাপড়া হতো। তারপর আমরা খালে গিয়ে সাঁতার কাটতাম। জুমুআর দিন স্কুল বন্ধ থাকতো। কিন্তু সেদিন জুমুআর নামাযে যেতে হতো তাই সাঁতারের জন্য যাওয়া সম্ভব হতো না। তখন আমাদের জন্য সাঁতার শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তীতে কাদিয়ানে সাঁতারের জন্য একটি ভালো সুইমিং পুল নির্মাণ করা হয়েছিল। এটা স্কুল ও কলেজের পাশেই নির্মাণ করা হয়। সেখানে আমরা নিয়মিত সাঁতার অনুশীলন করতাম। আর তখন সবচেয়ে ভাল সাঁতারো ছিলেন একজন বাঙালি ছাত্র। তার নাম মুসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেব। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রামে বসবাস করেন। (পাক্ষিক আহমদী ৩১ আগষ্ট ২০০১)।

হুযূরের স্মৃতি যখনই মনে করি তখন নিজে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে বেহেশ্‌ত নসীব করুন, আমীন।"

প্রজ্ঞাময়ী ও বিচক্ষণ জ্ঞানী মানুষ মির্যা তাহের আহমদ সাহেব শুধু ইসলামের খেদমতেই ফানাফিল্লাহ্‌ ছিলেন তা নয়, তিনি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিরাজমান সংকট নিরসনেও অবদান রাখেন। সম্ভবত: ১৯৬৭ সালে সফরকালে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ মোজাফফর)-এর প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ সাহেবের সাথে সভা করেছেন। ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ৪নং রোডের সংশ্লিষ্ট এক রাজনৈতিক নেতার বাড়ীতে আলোচনা সভা হয়। তখন দুরদর্শী জ্ঞানী মানুষ মির্যা সাহেবের সাথে উপস্থিত ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, ব্যারিষ্টার মোহাম্মদ সামসুর রহমান, এডভোকেট বদরুদ্দিন আহমদ, ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী এবং শাহ মুস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। ইসলাম ও কমিউনিজমের উপর আলোচনায় তিনি কমিউনিজমের অসারতা এবং ইসলামের সফলতায় বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি আলোকপাত করেন। তখন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন-আপনার দিকনির্দেশনা দীর্ঘ প্রসূত, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মত। বরং সারা বিশ্বে আন্দোলনে বিপ্লব ঘটিয়ে কমিউনিজমের মাধ্যমে সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এর উত্তরে ঐশীজ্ঞানে জ্ঞানবান আগামী দিনের অবক্ষয়মুক্ত বিশ্ব গড়ার রূপকার খোদার মনোনীত নেতা বলেন, বর্তমান পুঁজিবাজার-বিশ্বে কখনো কমিউনিজমের উত্থান সম্ভব নয়। কোথাও সাময়িক উত্থান হলেও ধ্বংস অনিবার্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তআলা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আর্থ-সামাজিক অবস্থার পট পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব। আর এ শিক্ষা সারা বিশ্বে বাস্তব রূপ দানের জন্য ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) আবির্ভুত হয়েছেন। অনুরূপ অনেক নামজাদা জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সাথে মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অবশেষে তিনি ঢাকা থেকে রাবওয়া ফিরে যান। (চলবে)

জামা'ত ও অংগসংগঠনসমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

পুস্তক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৭/১০/০৯ইং তারিখ বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শৈলমারী স্থানীয় মসজিদে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত পুস্তক 'ইসলামী নীতি দর্শন' এর ওপরে এক বিশেষ সেমিনার জনাব সালাহ উদ্দিন প্রেসিডেন্ট শৈলমারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব তারেক আহমদ, নযম পাঠ করেন তিফল শিমুল আহমদ। পুস্তকের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব তারেক আহমদ, তরিকুল ইসলাম, পুস্তকের আলোকে জীবন পরিচালনা করা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন আব্দুল জলিল, ইউসুফ আলী ও নুরুল ইসলাম। পুস্তকের সার্বিক দিক তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু, মোয়াল্লেম। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের আলোচনা ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

সাব্বির আহমদ

তরবীয়তি সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৫/১০/০৯ইং তারিখ রোজ রবিবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বটিয়া পাড়ায় জনাব মিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক বিশেষ তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুরআন থেকে পাঠ করেন জনাব ওল্টুর রহমান, কায়েদ বটিয়াপাড়া, নযম পাঠ করেন তিফল হৃদয় আহমদ। তরবিয়তমূলক বক্তৃতা করেন পর্যায়ক্রমে সর্বজনাব সোহেল রানা, আনোয়ার হোসেন, আমিনুজ্জামান, যয়ীম বটিয়াপাড়া এছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

মোহাম্মদ আমিনুজ্জামান

তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৯/১০/০৯ইং তারিখ বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলীর উদ্যোগে জনাব শহীদুল ইসলাম সাহেবের সভাপতিত্বে স্থানীয় মসজিদে এক তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে সরফরাজপুর, চৌগাছা, উথলী থেকে আগত বেশ কিছু জেরে তবলীগ মেহমানগণ অংশগ্রহণ করেন। একটানা ২ ঘন্টা এই তবলীগি আলোচনা সভা চলতে থাকে। আগত মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর কুরআন হাদীসের আলোকে প্রদান করেন স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম সাহেব। পরবর্তীতে MTA এর মাধ্যমে প্রচারিত 'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠানটি সরাসরি মেহমানগণ উপভোগ করেন।

রাজিব আহমদ চৌধুরী

তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩১/১০/০৯ইং তারিখ বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শৈলমারীর উদ্যোগে স্থানীয় মসজিদে জনাব সালাহ উদ্দিন প্রেসিডেন্ট সাহেব এর সভাপতিত্বে এক বিশেষ তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ইউনুছ আলী সাহেবের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে চুয়াডাঙ্গা জেলার মধ্যপাড়া, দর্শনা, দশমি, শাহাপুর গ্রামসমূহ থেকে জেরে তবলীগ ভ্রাতাগণ অংশগ্রহণ করেন। আগত মেহমানগণ খাতামান্নাবীঈন (সা.), ঈসা (আ.) এর মৃত্যু, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ও লক্ষণ এবং তাঁকে না মানার পরিণাম, উম্মতী নবী, আহমদী জামা'তের ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। কুরআন হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে প্রশ্নগুলোর এক গাম্ভীর্যপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন অত্র জামা'তের মোয়াল্লেম মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু। প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে ৫ জন ভ্রাতা অনুষ্ঠান শেষে বয়আত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মেহমানগণ MTA -তে "সত্যের সন্ধানে" অনুষ্ঠানটি সরাসরি উপভোগ করেন এবং আনন্দিত হন।

তারেক আহমদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়া 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকের ওপর সেমিনার

গত ২৮/১০/০৯ইং তারিখ রোজ বুধবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার উদ্যোগে জনাব গাজী মাজহারুল খোকন এর সভাপতিত্বে স্থানীয় মসজিদে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন জনাব যুবায়ের আহমদ স্বপন ও তৌফিক আহমদ ভুইয়া। আলোচনার শুরুতে উক্ত পুস্তকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব আসাদুজ্জামান ভূইয়া, জনাব এনামুল হক, জনাব ডা. খলিলুর রহমান ও মৌ. মোজাম্মেল হক স্থানীয় মোয়াল্লেম। পরিশেষে সভাপতি সাহেব তার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন এবং দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের পর সভার সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

এনামুল হক

নাখাল পাড়া হালকায় এম.টি.এ-তে 'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠানটি প্রদর্শন

গত ২৯, ৩০, ৩১ অক্টোবর ও ১লা নভেম্বর নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নিজস্ব টিভি চ্যানেল এম.টি.এ-তে লন্ডন থেকে সরাসরি 'সত্যের সন্ধান' নামে এক ঘন্টাব্যাপী তবলীগি প্রশ্ন উত্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সারা পৃথিবীর ন্যায় ঢাকার নাখালপাড়া হালকা মসজিদেও এই অনুষ্ঠান দেখানোর সুব্যবস্থা করা হয়। চারদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে নাখালপাড়া মসজিদে প্রত্যহ প্রায় ২০/২৫ জন অ-আহমদী ভাই খুবই আগ্রহ ভরে উপভোগ করেছেন এবং তারা বিভিন্ন প্রশ্নও করেন। এমন সুন্দর অনুষ্ঠান দেখে আগত মেহমানরা বলেন এর সময় আরো বাড়ানো উচিত।

মোহাম্মদ কামরুল আহসান

মিরপুরে আনসারুল্লাহ্ ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৬ ও ১৭ অক্টোবর, ২০০৯ শুক্র ও

শনিবার মজলিস আনসারুল্লাহ্, মিরপুর এর ৩য় বার্ষিক ইজতেমা অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব কাওসার আলী মোল্লা, নায়েব সদর। অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মোহতরম বি, আকরাম খান চৌধুরী, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুর। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, স্থানীয় যয়ীমে আলা। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, আহাদনামা পাঠ, নযম এবং দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এরপর ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রতিযোগিতা হয় এবং সন্ধ্যায় এমটিএ তে সরাসরি হুযূর (আই.) এর জুমুআর খুতবা মনোযোগ দিয়ে শুনেন সবাই। সন্ধ্যার পর আকর্ষণীয় তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব রুকুনুজ্জামান দুলাল, নায়েব যয়ীমে আলা, মিরপুর। উক্ত অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের রাবওয়া নিবাসী জনাব মোহাম্মদ তারিখ নাদিম সাহেব ঈমান বর্ধক বক্তব্য রাখেন।

বিকেল ৪ টায় সমাপনী ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী সাহেব সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে সদর সাহেব মজলিসের কার্যক্রম এবং তালিম তরবিয়ত বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যান বক্তব্য রাখেন। পুরস্কার বিতরণ, আহাদনামা পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

শালগাঁও মজলিসে বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ আগষ্ট শালগাঁও মজলিসে আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ আগষ্ট ০৯ সোমবার সকাল ৯ টায় জনাব সাঈদ আহমদ খন্দকার সাহেবের সভাপতিত্বে ও জনাব হুমায়ূন কবীর এবং জনাব আব্দুল আওয়াল মাষ্টার সাহেবের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অধিবেশন মসজিদে আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুল আওয়াল মাষ্টার। এরপর আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব, উদ্বোধনী অধিবেশনে তরবীয়তী বক্তব্য রাখেন জনাব সাঈদ আহমদ খন্দকার ও জনাব হুমায়ূন কবীর। বিকাল ৪টায় সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, যয়ীম এর সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন ১ম স্থান অধিকারী জনাব আব্দুল আওয়াল মাষ্টার, নযম পাঠ করেন প্রথম স্থান অধিকারী জনাব উমর ফারুক, নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব সাইদ আহমদ খন্দকার, জনাব শাহ আলম খাঁন। সভাপতির ভাষণের পর প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করে আহাদ পাঠ ও দোয়ার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ সুন্দরবনের স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৩০ ও ৩১ অক্টোবর রোজ শুক্র ও শনিবার মজলিস আনসারুল্লাহ্ সুন্দরবনের ২৭তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০০৯ অনুষ্ঠিত হয়। এতে রিজিওনাল নাযেম জনাব আব্দুল গফুর মাষ্টার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং জেলা নাযেম জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মোট ১৪২ জন আনসার ভাইদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৯১ জন। বাদ জুমুআ থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় এর পরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। শনিবার বাদ আছর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলা নাযেমের সভাপতি ও স্থানীয় আমীর এবং যয়ীমে আলা সাহেবের বক্তৃতার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

এম, রফিকুল ইসলাম

পুস্তক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১১/০৯/০৯ইং তারিখ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলী ও মজলিস আনসারুল্লাহ উথলীর যৌথ উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত পুস্তক 'বারাকাতুদ দোয়া' এর ওপর এক বিশেষ সেমিনার জনাব আব্দুল গফুর রিজিওনাল নাযেম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন তিফল নাভিদ আহমদ। উক্ত পুস্তকের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব সরফরাজ আব্দুস সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী, যয়ীম উথলী, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। এরপর মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব কিতাবের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

পুস্তক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৩/১০/০৯ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলী ও মজলিস আনসারুল্লাহ্ উথলীর যৌথ উদ্যোগে জনাব সামসুল হক মিয়া প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত কিতাব 'খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তকের ওপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মুয়ায্যেম আহমদ সানী। উক্ত পুস্তকের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব সরফরাজ আব্দুস সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী, তাহের খালেদ, রাজিব মাহমুদ, শাহীনুর ইসলাম। উক্ত পুস্তকের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের আলোচনা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

মোহাম্মদ আবুল হায়াত বিশ্বাস

শোক সংবাদ

গত ১৭ আগষ্ট ০৯ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রাজশাহীর আতফালুল আহমদীয়ার সদস্য জনাব আলিফ মোশাররাত, বাসায় ষ্ট্যান্ড ফ্যান চালু করতে গিয়ে বিদ্যুৎপিষ্ট হয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু বরণ করে (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১২ বছর। সে সরকারী মাদ্রাসার চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিল। তার পিতার নাম ডা: মোহাম্মদ শফিকুল আলম। সে সব সময় স্কুলে কেরাত প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করত এবং সহপাঠীদের সাথে অত্যন্ত বিনয়ী ও হাস্যোজ্জল ব্যবহার করত। তার এই অকাল মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্যধারন করার এবং তার আত্মার মাগফিরাতের জন্য সবার কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

দোয়াপ্রার্থী

এহ্তেশামুল বশির

"এপক্ষের কৃষিতে করনীয়"
১ডিসেম্বর হতে ১৫ ডিসেম্বর'০৯
১৬ অগ্রহায়ন হতে ১ পউষ।

চাষী ভাই, আমাদের দেশে কৃষিতে অগ্রহায়ন মাসের শেষ পক্ষ খুবই গুরত্বপূর্ণ। এসময়ে কৃষিতে প্রচুর কাজ থাকে। এপক্ষে একইসাথে আমন ফসল কাটা, মাড়াই , শুকানো,খড়ের পাজা দেয়া, বোরো রোপন, বীজ তলা তৈরী, এবং অন্যান্য রবি ফসলের পরিচর্যা করতে হচ্ছে। তাই এপক্ষকালে আপনাকে এবং আপনার পরিবারের সকলকে সার্বক্ষণিক ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। কৃষিতে আপনরদের অনেক অভিজ্ঞতা আছে। আজ এপক্ষে কিছু করনীয় কাজ স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এপক্ষের কৃষি পাতায় আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।

১) আমন চাষ :- দেশের দক্ষিণ -পশ্চিম অঞ্চলের চাষী ভাইয়েরা এ পক্ষকালটি ও আপনাদের আমন ফসল কাটার ভরা মৌসুম। শতকরা ৮০% ভাগ পাকলেই ফসল কেটে ঘরে তুলুন। বেশী পাকলে ফসলের মান ও ফলন দুই কমে যাবে। **আমন কাটার পর জমিতে ৩/৪টি চাষ দিয়ে মই দিয়ে রাখুন। বোরো চষের সময় পানির অপচয় কম হবে।**

চাষী ভা্ই নিজের প্রয়োজনীয় বীজ নিজে রাখুন। বিএডিসি থেকে বীজ নিয়ে উৎপাদিত আমন ফসল থেকে পর পর দুই বছর বীজ রেখে ব্যবহার করুন। তৃতীয় বছরে আবার বিএডিসি থেকে বীজ সংগ্রহ করে ব্যবহার করুন।

বীজের জন্য রোগমুক্ত প্লট নির্বাচন করুন।

কাটার পূর্বে বীজ প্লট আর একবার বিজাত বাছাই করুন।

কাটার সাথে সাথে মাড়াই ও রৌদ্রে শুকিয়ে নিন। কোন অবস্থাতে গুমানো যাবে না।

দক্ষিণ অঞ্চল এবং সিলেট ও ব্রাক্ষণবাড়িয়ার অঞ্চলে আগাম উফশী জাতের আমন কাটার ভরা মৌসুম। নাবী জাতের আমন এবং স্থানীয় জাতের আমনের এপক্ষে ফুল আসা শেষ হয়ে যাবে। ফুল আসার সময়ে খেতে পর্যাপ্ত পানি রাখর ব্যবস্থা করুন।

দক্ষিণ অঞ্চলের চাষী ভাইয়েরা আপনাদের অঞ্চলে কিছু কিছু আমন খেতে খেসারী কালাই চাষ হয়ে থাকে। অল্প পরিমান জমিতে মরিচ, মিষ্টি আলু, ফুটি , তরমুজ চাষ হয়ে থাকে। বোরো চাষের সুবিধা না থাকায় বাকী সব জমি দীর্ঘ সময় অনাবাদী থাকে। জমিকে সুষ্ঠভাবে ব্যবহারের জন্য আমন কাটার পর জমির উপযুক্ততানুসারে কোন জমিতে কোন ফসল চাষ করবেন, তার একটি পরিকল্পনা এখনই গ্রহণ করুন। আপনি ইচ্ছা করলে নিম্নে প্রদত্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন:-

নদী / খাল পাড়ের বেলে দোআঁশ এবং দোআঁশ জমিতে ফুটি/ তরমুজ/ মিষ্টিআলু/ মরিচ/ ধনে /চিনাবাদাম / মিষ্টিকুমড়া চাষ করতে পারেন। এজন্য আপনি এখনই জমি চাষ ও মই দিয়ে আগাছা পরিস্কার করে জমি তৈরী করে রাখুন।

নদী / খাল থেকে একটু ভিতরের জমিতে আপনি গিমা কুমড়া/মুগডাল চাষ করতে পারেন(এই ফসল দুইটি বিনা সেচে করা যায়)। এফসল কাটার পর আপনি আউশ চাষ করতে পারবেন। আউশ মৌসুমে আপনি বিআর-২১, ব্রিধান-৪৩ চাষ করুন। ১০০ দিনে ফসল পাবেন। আমন সঠিক সময় রোপন করতে পারবেন। এসকল জমির জন্য ''আমন, মুগডাল/ গেমি কুমড়া আউশ শস্য পর্যায় অনুসরন করতে পারেন।

চাষী ভাই দক্ষিণ অঞ্চলে রবি মৌসুম অনেক দেরীতে শুরু হয়। আবার তারাতারি শেষ হয়ে যায়। ফলে শীতের সব্জি চাষ ব্যহত হয় এবং উৎপাদন মারাত্মকভাবে কম হয়। তাই সব্জির অভাব লেগেই থাকে। আপনি লালশাক চাষ করতে পারেন। এশাকটি বারমাস চাষ করা যায়। নাবী জাতের মূলা চাষ করুন। এছাড়া নাবী জাতের বাঁধা কপি চাষ করতে পারেন।

দক্ষিণ অঞ্চলের চাষী ভাই, আপনি আগাম খরিফ সব্জির চাষ করতে পারেন। সেজন্য আপনি সেচের সুযোগ আছে যেমন, পুকুর ধারের/ খাল পারের জমি নির্বাচন করে রাখতে পারেন। তবে সব জমিই আমন কাটার পর ৩/৪টি চাষ দিয়ে মই দিয়ে রাখুন। এসকল জমিতে মাঘ মাসের প্রথম দিকে পুঁই শাক,ঢেরস , ডাঁটা চাষ করতে পারেন। এছাড়া লালশাক বার মাস হয় । শশা বারমাসী, খিড়া চাষ করতে পারেন। এ সকল জমিতে ''আমন পুঁইশাক/ঢেঁরস/ডাঁটা/লালশাক/শশা, আউশ শস্য পর্যায় অনুসরন করতে পরেন।

২) ভুট্টা চাষ:- আপনার খেতের ভূট্টা গাছে ৪-৬ টি পূর্ণ পাতা হলে আগাছা পরিস্কার করুন। ১ সে:মি: অন্তর অন্তর একটি সুস্থ স্ববল চারা রেখে বাকী গাছ তুলে ফেলুন এবং প্রথম সেচ দিন। আর ৮-১২ টি পূর্ণ পাতা হলে শেষবারের মত আগাছা পরিস্কার করুন। ২য় কিস্তি উপরি প্রয়োগ করুন। গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিন। গাছে রোগ দেখা দিলে দমনের ব্যবস্থা নিন। প্রয়োজনে খাকসার / উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিন।

চাষী ভাই ভূট্ট খেত আগাছামুক্ত রাখুন।

ভাল ফলনের জন্য বপন থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত খেত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

চারা গজানোর ২৫-৩০ দিনের মধ্যে প্রথম কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে ২য় কিস্তি নির্ধারিত মাত্রায় ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করুন।

জমিতে ভাল নিষ্কাশনের ব্যবস্থ রাখবেন। মনে রাখবেন অতিরিক্ত সেচ এবং কম সেচ দুই ভূট্টর ফলনের অন্তরায়। বৃষ্টির পর পরই পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করবেন। ভূট্টার কাণ্ড মাটির উপড় না উঠা পর্যন্ত জলাবদ্ধতা হতে দেয়া যাবেনা।

বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ এবং ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে ২য় সেচ দিন।

৩) **আগাম আঁখ চাষ:-** চাষ ভাই এ পক্ষকালে আগাম আঁখ চাষ শেষ করুন। রোগমুক্ত সুস্থ সবল বীজ ব্যবহার করুন। বীজ রোপনের পূর্বে শোধন করে নিন। চারা গজিয়ে ৪/৫ টি পাতা হলে নালায় উপরি প্রয়োগ করুন। হালকা মাটি দিয়ে সার ঢেকে দিন।

জমি সুনিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন।

এ পক্ষকালে আঁখা চাষের সাথে সাথী ফসল হিসাবে পিয়াঁজ, রসুন ধনে ইত্যাদী মসলা জাতীয় ফসল চাষ করতে পারেন।

৪) **ডাল জাতীয় ফসল চাষ:-**

এপক্ষকালে ডাল ফসলের অন্তরবর্তীকালীন পরিচর্যা করুন। বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে আগাছা পরিস্কার করুন।

৫) **তেল জাতীয় ফসল চাষ:-**

(ক) সরিষা চাষ:- এ পক্ষকালে সরিষার অন্তরবর্তীকালীন পরিচর্যা করুন।

বীজ বপনের ১৫-২০ দিনর মধ্যে একবার এবং ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে (ফুল আসার সময়) আর একবার আগাছা পরিষ্কার করুন।

বীজ বপনের ২৫-৩০ দনের মধ্যে প্রথম এবং ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে (ফল ধরার সময়) দ্বিতীয় সেচ দিন।

যদি বপনের সময় বোরিক এসিড প্রয়োগ করে না থাকেন তা হলে প্রতিলিটার পানিতে ৫ গ্রাম বোরিক এসিড মিশিয়ে স্প্রে করলে ভাল ফল পাবেন। মনে রাখবেন প্রতিটি সারই সরাসরি গাছে প্রয়োগ করা বিপদ জনক। তাই কখনই মাত্রাতিরিক্ত সার প্রয়োগ করবেন না।

(খ) তিসি চাষ:- তিসি খেত আগাছামুক্ত রাখুন। এটি একটি খড়া সহিষ্ণু ফসল। তবে প্রয়োজনমত সেচ দিলে ফলন ভাল হবে। তিসি কাটার পর পাট / আউশ চাষ করতে পারবেন।

(গ) চিনাবাদাম চাষ:-এ পক্ষকাল রবি চিনাবাদাম চাষের শেষ সময়। দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ মাটিতে চিনাবাদাম চাষ করুন। শেষ চাষে নির্ধারিত মাত্রায় জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করুন। চাষী ভাই **চিনাবাদাম চাষে অবশ্যই জিপসাম প্রয়োগ করবেন।**

ঢাকা-১ জাতের চিনাবাদাম চাষ করুন। বিএডিসির বীজ বিক্রয় কেন্দ্র /বিএডিসির অনুমোদিত বীজ ডিলারের নিকট বীজ পাবেন।

৬) বোরো চাষ:- এ পক্ষকালে জাতের জীবনকাল এবং মূল জমি প্রাপ্যতা বিবেচনা করে ধাপে ধাপে বীজ তলা করুন।

সিলেট অঞ্চলের সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ জেলার এবং ঢাকা অঞ্চলের ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর এবং গোপালগঞ্জ জেলার নিম্ন অঞ্চলের চাষী ভাইয়েরা আপনাদের মূল জমি থেকে পানি নেমে যাবার সাথে সাথে বোরো রোপন শুরু করুন। শেষ চাষে অবশ্যই নির্ধারিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন।

আগাম বন্যামুক্ত এলাকার চাষী ভাইয়েরা যারা নাবী আমন এবং সরিষা কেটে বোরো চাষ করবেন, তারা এপক্ষকালে মূল জমির প্রাপ্যতা বিবেচনা করে ধাপে ধাপে ব্রিধান -২৮ ও ২৯ জাতের বীজ তলা করুন। এপক্ষের মধ্যে বীজ তলা করা শেষ করুন। শীতের সময় বীজ তলায় চারা গজাতে অসুবিধা হয়ে। **তাই ভাল করে গজানোর পর বীজতলায় বীজ বপন করুন।**

৭) গম চাষ:- এপক্ষকাল গম ফসলে ১ম সেচ এবং ১ম কিস্তি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করার উত্তম সময়। গম বীজ বপনের ১৭ দিন পর ১ম সেচ এবং উপরি প্রয়োগ করুন। জমিতে জোঁ আসলে আগাছা পরিস্কার করুন।

৮) **আলু চাষ:**-চাষী ভাই এপক্ষকালে আলু চাষ করবেন না।

প্রতিদিন আলু খেত পরিদর্শন করুন। গজানো গাছ পর্যবেক্ষণ করুন। ভাইরাস আক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে পুতে ফেলুন। স্টোলেন বের হলে ১ম সেচ দিন এবং উপরি প্রয়োগ করুন।

পোকার আক্রমন থেকে রক্ষা পেতে আলু খেতের কাছে সরিষা, সীম চাষ করবেন না।

৯) এপক্ষকালে ইতি পূর্বে রোপনকৃত কলা, আনারস এবং পেপের চারার আগাছা পরিস্কার করুন। সার উপরি প্রয়োগ করুন। প্রয়োজনে সেচ দিন। যত্ন নিন।

১০) শীতকালীন সব্জি চাষ:- চাষী ভাই, এপক্ষকালে বেগুন, মূলা, আলু, সীম, কপি ইত্যাদি সহ শীতকালীন সব্জির যত্ন নিন। উপযুক্ত সময় ফসল তুলুন। বাজারজাত করুন। নতুন লাগনো সব্জির যত্ন নিন।

আগাম জাতের মিষ্টি কুমড়া চাষ করুন। জমি উত্তম রূপে চাষ এবং মই দিয়ে তৈরী করুন। শেষ চাষে নির্ধারিত মাত্রার অর্ধেক সার প্রয়োগ করুন। বাকী সার মাদায় মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। সার প্রয়োগের ১০ দিন পর চারা/বীজ রোপন করুন।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী জিরায়া'ত
আ:মু:জা: বাংলাদেশ।

দোয়ার আবেদন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রবীণতম আহমদী, চট্টগ্রাম জামা'তের নায়েব আমীর ও সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন, বয়োজ্যেষ্ঠ বুযুর্গ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ **প্রিন্সিপাল মোহতরম মুসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেব দীর্ঘ কয়েক মাস থেকে অসুস্থ আছেন।** তার আশু রোগমুক্তি, পূর্ণ সুস্থতা ও দীর্ঘায়ূর জন্য জামা'তের ভ্রাতা-ভগ্নি সকলের কাছে বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ্ তাআলা যেন তাকে পূর্ণ সুস্থতা দান করেন।

দোয়াপ্রার্থী

জেনারেল সেক্রেটারী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রাম